এখন ডুয়ার্স

১-১৫ জুলাই ২০১৭। ১২ টাকা

গুরুং দাপটে জ্বলন্ত পাহাড় ভুল রাজনীতির চলন্ত মাশুল

ভিন রাজ্যের হাসপাতালে ডুয়ার্সবাসীর আস্থা আজও অটুট, মিলছে রোজগারের পথও

অবহেলা জীর্ণতায় ১২৯ বছরের বার লাইব্রেরি

ডুয়ার্সে আষাঢ় মানে ডি-ইলিশিয়াস

বক্সা বাঘবন নিয়ে আক্ষেপ এবার মিটবে!

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা আমাদের জীবনকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিয়েছে, কিন্তু তার সাথে অনেক অসুখও এনে দিয়েছে।
তার মধ্যে **কোষ্ঠকাঠিন্য** অন্যতম.................

কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে ৪ টি টিপস্ ঃ-

১. প্রচুর জল খান, প্রতিদিন অন্তত ৩ লিটার।

২. দৈনন্দিন খাবারে ফাইবারযুক্ত খাবারের মাত্রা বাড়ান।

৩. মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।

৪. রোজ অন্তত ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করুন।

Issued for the public interest by **Pharmakraft**

From the makers of :

PICOME Susp.

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

রাজবাড়ির দিঘি এখন জলপাইগুড়ির বিশেষ স্থানগুলোর মধ্যে একটি। এটির সৌন্দর্য্যায়নের ফলে বহু মানুষ আসছেন একটু মুক্ত পরিবেশে শ্বাস নেওয়ার জন্য। জলপাইগুড়ির শহরের মানুষও যেমন ভিড় করেন এখানে তেমনই যেসব পর্যটকরা আসছেন বাইরে থেকে তাঁদের জন্যও এটি একটি দ্রষ্টব্য স্থান। নোংরা আবর্জনায় মৃতপ্রায় শতাব্দী প্রাচীন এই ঐতিহ্যময় দিঘিটিকে সংস্কার করার ফলে যেন নতুন করে অক্সিজেনের যোগান ঘটেছে শহরের ফুসফুসে। তেমনই রাজবাড়ির দিঘি একঘেয়ে নাগরিক জীবনে নিয়ে এসেছে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া।

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা। শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭
পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

এই সময় চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারত আলিপুরদুয়ার পর্যটন !

সম্পাদকের ডুয়ার্স

পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড-এর দাবিতে সহিংস আন্দোলনের জের সরাসরি পড়ে সেখানকার পর্যটনের উপর। সেই আশির দশক থেকে একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আসছি আমরা। বারবার অবরুদ্ধ হয়েছে বাংলার পাহাড়ি পথ। মাঝেমধ্যে সমঝোতার আবহাওয়ায় সাময়িক শান্তি নামলেও কিছু দিনের মধ্যেই আবার যে কে সেই পরিস্থিতি। একটা সময় দার্জিলিং-এর নাম প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল পর্যটন দুনিয়া। টাইগার হিল-সান্দাকফু বা লাভা-লোলেগাঁওয়ের পথে টুরিস্টের আনাগোনা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পর্যটনশিল্পে তরতর করে উঠে আসে প্রতিবেশী সিকিম। 'দার্জিলিং-এর ভুল থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি, আগে রোজগার ও সুখ, তারপর আসুক জাত্যভিমান', এই ছিল সিকিমের পর্যটন কারবারিদের সোজাসাপ্টা উত্তর। তার ফলে ছোট্ট সিকিম আজ আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের জায়গা করে নিতে পেরেছে বিজ্ঞাপনের চমকে, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশাসনিক দৃঢ়তায়। যার সিংহভাগ কৃতিত্ব অবশ্যই সিকিমকে দিতে হবে, কারণ দার্জিলিং-এর শূন্যস্থান পূরণে তাদের সিদ্ধান্তে কোনও গড়িমসি ছিল না।

সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিং-এর শূন্যস্থান ভরাটের সুফল পেয়েছিল গরুমারা। পর্যটন পরিমণ্ডলে পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের আলো পেয়েছিল ডুয়ার্স। লাটাগুড়ির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে পত্তন ঘটে মূর্তি, ধূপঝোড়া, রামসাই ইত্যাদি ইকো পর্যটন কেন্দ্রগুলির। এই সময় বন্য প্রাণ শাখার উদ্যোগে ইকো টুরিজমের প্রসার গরুমারাকে বিকল্প পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল। বছর বছর পর্যটকসংখ্যা বাড়তে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে রিসর্ট, গাড়ি ইত্যাদি। গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলন ও পাহাড়ে অশান্তির সুযোগে পর্যটন দুনিয়ায় স্থিতিশীল জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে গরুমারা তথা ডুয়ার্সের নাম। যাতে আখেরে লাভবান হয়েছে বাংলার পর্যটন।

যদিও সামগ্রিক ডুয়ার্সের কথা ভাবলে গরুমারা একটি নামমাত্র অংশ, কিন্তু গরুমারার জনপ্রিয়তার সুফল ভোগ করেছে সামসিং-সুনতালেখোলা ও ঝালং-বিন্দু। অথচ পূর্ব ডুয়ার্স যা মূলত আজ আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যেই পড়ে তার শ্রীবৃদ্ধি কিন্তু সেরকমভাবে ঘটেনি। 'আজকের বাজারে জলদাপাড়া যেটুকু করে খাচ্ছে তা তার নিজস্ব পুরনো গ্ল্যামার ভাঙিয়েই।' কিন্তু তার আশপাশের নতুন গড়ে ওঠা ইকো পর্যটন কেন্দ্রগুলো আবার প্রায় হারিয়ে যাওয়ারই পথে। আর বক্সা টাইগার রিজার্ভের পর্যটন সীমাবদ্ধতার কথা তার প্রাকৃতিক সম্পদের চাইতে মানুষের কাছে অনেক বেশি কুপরিচিত। সব মিলিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটনের প্রসার কমবেশি সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। এমনকি নতুন সরকারের উদ্যোগময় ছ'বছর পরেও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার হয়নি।

তাই আজ যখন দেখি দার্জিলিং-এর টুরিস্ট দিশেহারা হয়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলে খুঁজে বেড়ায় উন্নত যোগাযোগ বা পরিবহণ ব্যবস্থা এবং রিসর্ট-হোটেলের ঠিকানা তখন নীরবেই থেকে যায় পূর্ব ডুয়ার্স। অথচ আজ আলিপুরদুয়ারগামী ট্রেনের সংখ্যা খুব কম করে হলেও আধ ডজন তো বটেই। এর মধ্যে আবার কয়েকটি আছে সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। পাশেই রয়েছে কোচবিহারের মতো হেরিটেজ গন্তব্যের সম্ভার। এসব সত্ত্বেও ডুয়ার্সের পূর্ব ভাগে পর্যটকের হাজিরা বাড়ছে না। আজ গুরুং সাহেবের 'প্রতিরোধ' যখন পর্যটকের অভিমুখ পাল্টে দিচ্ছে তখন সেই সুযোগকে প্রকৃত কাজে লাগাতে পারলে ডুয়ার্সের এই 'অনাঘ্রাত' অংশটির জনসংযোগ এই ফাঁকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলা যেত। অন্তত গরুমারার গড়ে ওঠা সেই কথাই বলে। চতুর্থ জন্মদিন উদ্‌যাপনের সঙ্গে নিজেদের জেলার পর্যটন উন্নয়নে এই ছোট্ট ভাবনাগুলি বাস্তবায়িত করার আন্তরিক প্রয়াস নিতেই পারেন আলিপুরদুয়ারের জনপ্রতিনিধিরা।

চতুর্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১-১৫ জুলাই ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫
উত্তরপক্ষ ৮
ভিন রাজ্যের হাসপাতালেই ডুয়ার্সবাসীর অটুট আস্থা, রোজগারের নতুন পথও
চায়ের ডুয়ার্স, ডুয়ার্সের চা ১০
ব্র্যান্ড ডুয়ার্স বাঁচিয়ে রাখতে আবেগ নয়, প্রয়োগে হতে হবে কঠোর বাস্তববাদি ও উৎপাদনমুখী
কভার স্টোরি
গুরুং দাপটে জ্বলন্ত পাহাড় ভুল রাজনীতির চলন্ত মাশুল ১৬
বক্সা বাঘবন সব আক্ষেপ মিটবে! ২০
ডুয়ার্স তরাই শতাব্দী এক্সপ্রেস ৩০
১২৯ বছর পূর্ণ করে কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশন
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ১৪
লাল চন্দন নীল ছবি ৩২
তরাই উৎরাই ৩৫
ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩৭
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৩
নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬
ডুয়ার্সের ডায়েরি ৪০
কেজো মানুষের কাহিনি
দুঃস্থ মেধাবীদের পাশে বছরভর থাকেন 'অখ্যাত' তৃণমূলী মদন ২৯
ডুয়ার্সের অনাদৃত রতন
সুনীল পাল ৪২
শ্রীমতী ডুয়ার্স
'শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব' শুরু শিলিগুড়িতেও ২৬
ডুয়ার্সের ডিশ ২৬
শান্তির প্রচারে শিল্পী ২৭
সফল আবৃত্তিকার হওয়াই স্বপ্ন প্রত্যুষার ২৮
জীবন সংগ্রামে বেতশিল্পী আয়না দাস ২৮

প্রচ্ছদ ছবি: উজ্জ্বল ঘোষ, আইএফএস

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস,
প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

খুচরো ডুয়ার্স

সর্পানিয়ন

সর্প এবং অনিয়ন যোগ যাকে বলে। বানারহাটের দিনবাজারে ভারী খুশিয়াল মনে সবজির বস্তা সাজাচ্ছিলেন ব্যাপারী। এমনিতেই দেশে নিরামিষ খাওয়ানোর জন্য গবেষকরা উঠেপড়ে লেগেছেন। স্রেফ ঘাস খেলেই নাকি ভীম ভীম সন্তানের জন্ম দেওয়া যাবে! তবুও কিছু দেশদ্রোহী পেঁয়াজ-রশুনের খোঁজ করেন বলে বস্তা বোঝাই করে তা বাজারে আনতেই হয়। তিনিও এনেছিলেন। তা এহেন পাপকর্ম রোজ রোজ করবে, আর মা মনসা শাপ দেবে না? তাই পেঁয়াজের বস্তা সরাতেই মূর্তিমান শাপ! থুড়ি সাপ! এক্কেবারে মার্কামারা গোখরো একখানা! কিছুতেই সে ব্যাটা সরবে নাকো! শেষে অনেক কাণ্ড করে তাকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো গেলেও শোনা যাচ্ছে, অভিশাপের সাপ নয় সেটা। জমিয়ে ইঁদুর-ব্যাঙের মাংস খাবে বলে পেঁয়াজ কিনতে এসেছিল! আহা! বেচারা! বোধহয় ‘নিরামিষ ভক্ষণে উত্তম সন্তানলাভ’ বিষয়ে কেউ তাকে কিছু জানায়নি! এখন যদি তার ছানাদের পাঁচখানা করে ঠ্যাং গজায়— তবে?

ওসিতে ওসিতে

অসিযুদ্ধ তো জানতুম রে বাপ! লেকিন ওসিযুদ্ধ? আজ্ঞে কত্তা, রায়গঞ্জে তেমনটাই হইল বটেক! পুলিশের এক ওসি জামাইবাবু আরেক ওসি সূর্যবাবুর সঙ্গে এমন যুদ্ধ করেছে যে পাবলিক থ! জানা গেল, সূর্য ওসি নাকি হেলমেটহীন মস্তকে বাইক চেপে যাচ্ছিলেন আর তা-ই দেখে জামাই ওসি তাঁর পথরোধ করে একশো টাকা ফাইন হাঁকিয়ে দেন। ব্যাস! এই নিয়ে তক্কাতক্কি,

গালাগালি— শেষে বেজায় কিলাকিলি! কেউই নাকি কম যাননি। তবে শাস্ত্রে বলেছে যে, ওসির চেয়ে মসির জোর বেশি— তাই পাক্কা আধা ঘণ্টা ঘুসোঘুসির পর শেষটায় দু’জন দু’জনের বিরুদ্ধে রিপোর্ট লিখে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। বিনা টিকিটে এমন উত্তেজনাপূর্ণ মুষ্টিযুদ্ধ দেখে আপ্লুত দর্শক নাকি এখনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি যে দোষটা কার। মানে, দোষী কোন ওসি।

রক্তচাপ

একেই বলে হাসপাতালের হাই ব্লাড প্রেশার। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে রক্ত বাড়ন্ত হচ্ছিল বলে রক্তদানে উৎসাহ দেওয়ার জন্য জোর প্রচার চালিয়ে বেজায় চাপে পড়ে গিয়েছে তারা। মহানন্দে রক্তদান শিবির বসিয়ে এত্ত রক্ত জোগাড় হয়েছে যে ব্লাড ব্যাঙ্কের সিন্দুক উপচে পড়ছে। আরও দেড় ডজন শিবির নাকি বাকি! তা ব্যাঙ্ক বলে তো আর রক্ত ধার দেওয়া যায় না! তাই আরও আরও রক্ত এলে পরিস্থিতি যে শক্ত হয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য! তাই বেচারা সুপারবাবু নাকি রক্তদান শিবির না করার জন্য আয়োজকদের হাতে-পায়ে ধরছেন! দেখিস বাপ! রক্ত নিয়ে হেলাফেলা করিসনে! শোনা যায়, কারা জানি অতীতে রক্ত দিয়ে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়তে গিয়েছিল! রক্তের নামে অমন নেকু নেকু রোমান্টিক পদ্য লিখিসনে বাপ! শিবির বরং মলতুবিই রাখ।

জলে

আহা! বালুরঘাটের পাবলিকের বড় আশা ছিল যে, এবার বর্ষার জল তিরিশ কোটির নালা বেয়ে সুবোধ বালকের মতো নেমে যাবে শহর থেকে। কিন্তু নালায় যে তালা মেরে রাখা আছে, সে তো জানা ছিল না! বর্ষা সবে একটু আলাপ করেছে কী শহর ভেসে থইথই! তবে যে তি-রি-শ কোটি খচ্চা করে, ঘটা করে নালা-নর্দমা খোঁড়া হল? শুনে প্রাক্তন কত্তা বলছেন, নালা ভরতি কাদা। সাফ না করলে জল তো পথেই বসবে! পালটা বর্তমান কত্তা বলছে, নালা এক্কেবারে চকচকে পরিষ্কার— প্ল্যানটাই আসলে গোলমেলে ছিল। এহেন তক্কাতক্কি শুনে পাবলিক গম্ভীর মুখে রায় দিয়েছে যে, এমনিতেই বর্ষার এত জল— তার উপর তিরিশ কোটি জলে ঢাললে জল বেড়ে গিয়ে পথেঘাটে ঘুরে বেড়াবে— এটাই তো স্বাভাবিক। তা এফিডেভিট করে বালুর বদলে শহরের নাম জলেরঘাট করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!

রেলের মুরগি

না নেই! টিকিটের টিকিও নেই গঙ্গারামপুর স্টেশনে। টিকিট কেটে সে স্টেশন থেকে মোটেই ট্রেনে চাপতে পারবেন নাকো! সারি সারি টিকিট কাউন্টার অবশ্যি আছে। কিন্তু সেখানে টিকিট বেচার মতো কেউ নেই রে দাদা! তবে কি সে স্টেশন থেকে বিন টিকিটে ট্রেনে চাপার সুযোগ দিচ্ছে রেল কোম্পানি? হুঁ হুঁ বাবা! সে গুড়েও বালি! তার বদলে আছে ভয়ংকর ফাঁদ! টিকিট না পেয়ে আপনি তো চড়লেন ট্রেনে। তারপর ট্রেন চলতে শুরু করল। তারপর হাজির টিটি-ই। আপনাকে বিনা টিকিটের যাত্রী বিবেচনা করে ঘচাং করে ধরিয়ে দেবে জরিমানার সিলিপ! ফাইন দিয়ে আলুভাতের মতো মুখ আর বেগুনপোড়ার মতো মেজাজ নিয়ে আপনি তখন রেল কোম্পানির ‘মুরগি’ হয়ে

গিয়েছেন। ভাবুন তো কী চমৎকার প্ল্যান! হাঁদা গঙ্গারাম হওয়ার এমন চান্স নেবেন নাকি দাদা?

কেঁপে গিয়েই

চালবাজ জাল ডাক্তারের তো অভাব নেই। কপাকপ ধরাও পড়ছে তারা। তা সে দিন মালদার এক পুলিশনি সাদা পোশাকে গিয়েছিলেন ডাক্তার দেখাতে। না না! আর দশটা মানুষের মতোই চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন তিনি। বাঘা ডাক্তার বলে কথা! ১৬ বছর ধরে প্র্যাকটিস! চেম্বারে সেই ভিড়। তাই সেরে ওঠার বাসনায় সাদা মনেই সাদা পোশাকে নাম লিখিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ডাক্তারের পরীক্ষা করার পদ্ধতি দেখে ভুরু কুঁচকে যায় তাঁর। দেখছেন তো দেখেই যাচ্ছেন। তা পুলিশের মন বলে কথা! কেমন জানি 'ডাউট' হল দিদিমণির। ফস করে বলে ফেললেন, 'আমি কিন্তু পুলিশ।' ব্যাস! যেই বলেছেন— অমনি ডাক্তারের শরীরে সে কী ভূমিকম্প! কাঁপতে কাঁপতে রোগী ছেড়ে সেই যে ভাগলবা হলেন, আর দেখা নেই। অবশ্যি পরে তাঁর দেখা পেয়েছে পুলিশ। এখন তিনি জেল হেপাজতে বসে কাঁপছেন। হাজার ওষুধেও নাকি থামছে না সে কম্প!

কে ভাগায়

ভারী আমোদ নকশালবাড়ি লাগোয়া নেহালজোতে হামলা চালাতে আসা হাতিদের। কেউ তাড়াচ্ছে না তাদের। আগে তারা নেপালে হামলা চালাতে যেত। কিন্তু সীমান্তে বিদ্যুৎবেড়া বসিয়েছে নেপাল সরকার। তাই 'শক' পেয়ে নকশালবাড়ির আশপাশে শক ট্রিটমেন্ট চালাচ্ছে মহানন্দে।

নিত্য নিত্য হাতির শকে পাবলিকের চোখে সরষে। হামলাবাজ হস্তীদের কোন কোন ফরেস্টে রেঞ্জের লোকেরা তাড়াবে— সে নিয়ে জটিল তর্ক চলায় বিনে বাধায় পাবলিকের চাল-আটা-ভুট্টা-হাঁড়িয়ে খেয়ে, ঘরবাড়ির বারোটা বাজিয়ে, খেতকে মাঠ বানিয়ে বেশ ফুর্তিতে আছে তেনারা। আবার নাকি শোনা যাচ্ছে, হাতি বিতাড়ক কর্মীরা সবাই বুড়ো হয়ে গিয়েছে। সরঞ্জাম বলতে আদ্যিকালের ক্যানেস্তারা। বন্দুক অবশ্য আছে, তবে কিনা গুলি নেই। তা-ই নাকি? তা হাতিদের লম্বা লম্বা কানে কি এ বার্তা প্রবেশ করেছে? নকশালবাড়ির হাতি বলে কথা!

টুক্রাণু

হাতিমস্তান বাঁয়া গণেশের ফর্ম অব্যাহত। বর্ষা ভ্যানিশ হওয়ায় জলের অভাবে লোকালয়ে অভিযান বুনোদের। দিনহাটা হাসপাতালের সামনে টোটো গাড়ির ভিড় দেখে পাবলিক ভাবছে, সেটা টোটোর গ্যারেজ। বামনগোলার এক স্কুলের চল্লিশ কুইন্টাল চাল একাই খেয়ে ফেলেছেন হেড়ু। টাউনে আর হাঁটবেই না শুয়োর— প্রমিস জলপাইগুড়ি পৌরসভার। জলপাইগুড়ি জেলে 'ঘানি' এল কয়েদিদের জন্য। শোনা গেল, কোচবিহারের ক্যানসার সেন্টার নিজেই কর্কটরোগাক্রান্ত। একটা ভদ্র হাতি চালসায় গেরস্তের বাড়িতে ঢুকে শুধু কাঁঠাল খেয়ে চলে গিয়েছে। হলদিবাড়িতে অশ্লীলতার অভিযোগে দাদুর বয়সি সাধুকে প্রহারপ্রণামি প্রদান। আরেক সাধুর কীর্তনের ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে থানায় নালিশ বালুরঘাটের গ্রামে। ৯৫ বছরে নতুন দাঁত গজানোর কারণে লাটাগুড়িতে মুখেভাত হল বৃদ্ধার।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি

বিশ্বাস বুক এজেন্সি

৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির

অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি

ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

মালবাজার

বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬৮৩৯৮৮

চালসা

দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি

রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল

৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া

বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

লাটাগুড়ি

বিশ্বজিৎ রায় ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি

দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা

অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

আলিপুরদুয়ার

দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার

জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪

আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়

৯৮৫১২৩৪৮৮৯

মাথাভাঙা

নেপাল সাহা ৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭

মালদা

অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি

৯৯৩২৯৬৭৯৯১

রায়গঞ্জ

সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২

বালুরঘাট

মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন

৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক

০৩৩-২২৫২৭৮১৬

কলকাতা নয়, ভিন রাজ্যের হাসপাতালেই আজও ডুয়ার্সবাসীর অটুট আস্থা, রোজগারের নতুন পথও

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

ধূপগুড়ির বাসিন্দা রাজেনবাবু কানে ব্যথার জন্য প্রথমে ধূপগুড়ি, তারপর জলপাইগুড়িতে ডাক্তার দেখান। বারো দিন পর ব্যথা কমার লক্ষণ না দেখায় তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করে 'তৎকালে' দক্ষিণ ভারত যাত্রা করেন। সহযোগী রাজেনবাবুর শালা আমাকে বলেছিল, 'ট্রেনেই জামাইবাবুর ব্যথা একদম কমে যায়। তবুও আমরা চেন্নাইয়ে অ্যাপোলো হাসপাতালে যাই। নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর ডাক্তারবাবু জানান, বর্তমানে কানে কোনও সমস্যা নেই। তবে জামাইবাবুর পাইল্‌স ধরা পড়ে।' খামখা অর্থদণ্ড ছাড়া কিছু নয়।

আমার এক ভ্রাতৃপ্রতিম সহকর্মী অরিজিৎ সরকার, কানে একটু কম শোনে, সিদ্ধান্ত নেয় চেন্নাই যাওয়ার। স্ত্রী, কন্যা, শালিসহ অরিজিৎ এবং আমি— চারজনের টিম। দার্জিলিং মেলে কলকাতা, পরদিন করমণ্ডলে চেন্নাই। অ্যাপোলো হাসপাতালের কাছেই গ্রিম্‌স রোড। দু'কামরার ঘর এবং গ্যাস ও রান্নার বাসনপত্রসহ একটি রান্নাঘর অর্থাৎ পুরো একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করা হল। এলাকার পানীয় জল ভাল নয়। প্রত্যেক গলিতেই জলের (পরিশোধিত?) জার কিনতে পাওয়া যায়। তখনও আঁধার ঘনায়নি। আমরা হাজির হলাম অ্যাপোলো হাসপাতাল। তখন অল্প টাকায় নাম নথিভুক্ত করা যেত। দেওয়ালে লম্বা তালিকায় ডাক্তারদের নাম লেখা। কোন ডাক্তার দেখাতে হবে, আমরা বলে দিলাম। আগের দিন সন্ধ্যায় নাম নথিভুক্ত থাকায় পরদিন সকালে লম্বা লাইন দিতে হবে না।

এর পর দল বেঁধে গ্রিম্‌স রোডের পাশে বাজারে গিয়ে তেল-মশলা, চাল, ডাল, তরকারি, ডিম ইত্যাদি বাজার করে ঘরে এলাম। সেটা জুলাই মাস, ব্যাপক গরম। ভাগ্যিস একটা ঘরে এসি ছিল। রান্না-খাওয়া সেরে আমি ও অরিজিৎ খাটে টানটান। একটু পরে টিমের তিন মহিলা মেঝেতে চাদর বিছিয়ে ঘুম।

আমরা সবাই খালি পেটে পরদিন সকালে হাসপাতালে। ডাক্তারের সেক্রেটারির কাছে বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই চেম্বারের ভিতরে প্রবেশ। অমায়িক ব্যবহার ডাক্তারের। উনি বেশ কিছু পরীক্ষা এবং একটি এক্সরে করতে বললেন। তৎক্ষণাৎ সব পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়ে গেল। দুপুর বারোটায় বাসায় ফিরে রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া।

অরিজিতের স্ত্রী সুজাতা দাঁতের সমস্যার জন্য দন্ত বিভাগে ডাক্তার দেখাতে চাইল। অরিজিৎ সরাসরি জানাল, সে যেতে পারবে না। অগত্যা ওদের সঙ্গে আমি এলাম দাঁতের ডাক্তারের কাছে। এ ডাক্তার বেশ মজার— বাংলায় কথা বলে। বেশ ফরসা গায়ের রং। ডাক্তার জানাল, নিচের পাটির সামনের পাঁচটি দাঁত তুলে ফেলতে হবে, এবং পরদিন পাঁচটি দাঁত এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হবে যে দেখলে বোঝাই যাবে না দাঁতগুলো নকল। সুজাতা আমার মতামত চাইল। আমি কিছুই বলিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই দাঁত তোলা হল এবং একদিন বাদেই নতুন দাঁত বসানো হল। তারপর বহুদিন কেটে গিয়েছে, ওই দাঁত কোনও সমস্যা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই ব্যয়বহুল।

ইতিমধ্যে অরিজিতের কানের নানা পরীক্ষা হল। ডাক্তারবাবু বললেন, শোনার ক্ষমতা বাড়বে না— তবে আর যাতে বেশি খারাপ না হয়, তার জন্য পরামর্শ ও সামান্য ওষুধ দিল।

আমার তো শুধুই প্রেশারের ওষুধ পালটানো হয়েছিল। আর-একজন মহিলা ডায়েটিশিয়ান আবার খাদ্যতালিকায় অনেক

সিএমসি ভেলোর হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পাড়ি দিয়েছেন বাংলার বহু রোগি

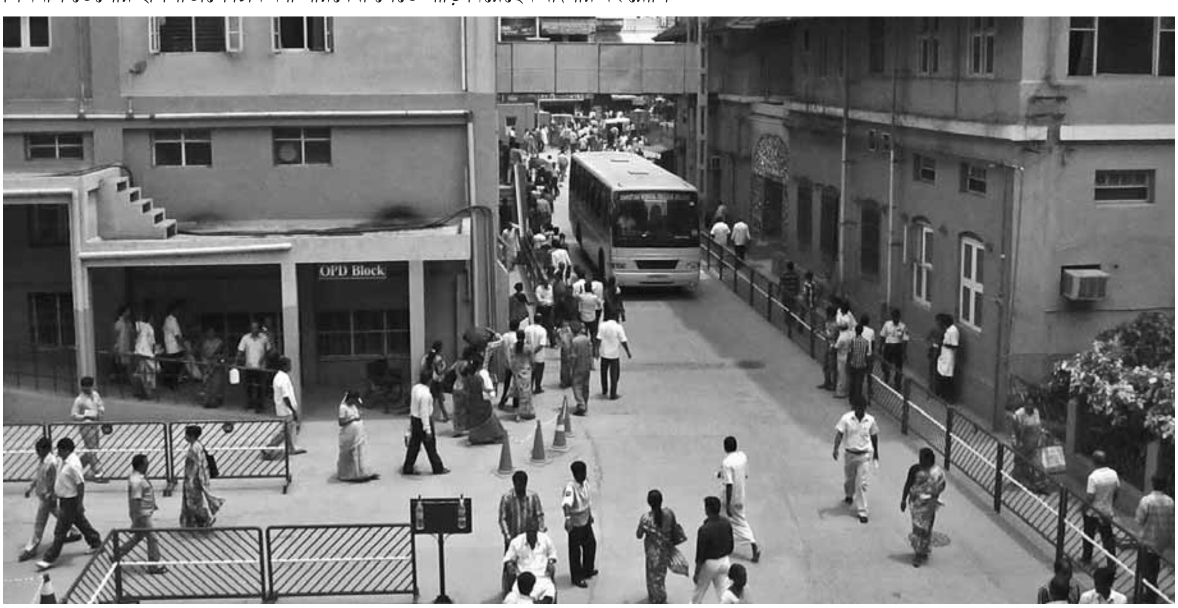

কিছু বাদ দিয়ে দিলেন, এবং নিরামিষ খাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

এদিকে মূলত উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষ, বিশেষত বাঙালিরা এবং বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক বাঙালি ভিড় করে প্রতিটি দিন। ভাষা গভীর প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে— অর্থাৎ তারা মূলত বাংলাই বলে, আর দু'-চারটে ভাঙা ভাঙা হিন্দি। ডাক্তারের কাছে পৌঁছাতে, সঠিক পরিষেবা পেতে আমরা অনেককে সাহায্য করেছি। বেশ কিছু মানুষ ভেলোর থেকে ঘুরে এসেছেন— কারণ মোটা (বড়) ডাক্তার দেখাতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। অ্যাপোলোর প্রতিটি ফ্লোরে প্রতিটি কাউন্টার ঘিরে নজরদারি চালায় একদল দক্ষ কর্মী। তাদের দুটো কাজ। প্রথমত, সঠিক ডাক্তার বা পরিষেবার ব্যবস্থা। আর দ্বিতীয়ত, কোনও রোগী যেন বিরক্ত হয়ে অ্যাপোলো ছেড়ে অন্য কোনও হাসপাতালে না যায়। হয়ত আপনাকে এন্ডোস্কোপি করতে বলা হয়েছে। যতক্ষণ আপনি সঠিক কাউন্টারে গিয়ে ওই পরীক্ষার টাকা জমা না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আপনার পিছনে লেগে থাকবে একজন দক্ষ সেলসম্যান।

এর পর প্রতিদিন বিকেলে অসংখ্য বঙ্গজর ভিড়ে আমরাও মেরিনা বিচে বা টি-বাজারে স্টেনলেস স্টিলের বাসন কেনাকাটা করতাম। তারপর গাড়ি ভাড়া করে দল বেঁধে চললাম চেন্নাই দর্শনে। অর্থাৎ তখন আমরা নির্ভেজাল টুরিস্ট, মোটেই চিন্তাগ্রস্ত রোগী নই।

প্রফেশনালিজমের সংজ্ঞা আমার জানা নেই, তবে আমি বুঝি, 'পয়সা বুঝে নেব এবং সঠিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করব।' বহুদিন ধরেই দক্ষিণ ভারতের এইসব হাসপাতালে 'ওয়ান আমব্রেলা' দর্শন মেনে সমস্তরকম পরিষেবা একই ছাদের তলায় পাওয়া যাচ্ছে। অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে না। তবে সিএমসি ভেলোরের ব্যাপারে বিপণন বিশেষজ্ঞ উৎপল রায়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন, সিএমসি-র সঙ্গে ইন্টারনেটে যোগাযোগ করে যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাক্ষাৎকার অগ্রিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয় তাহলে চিকিৎসা পেতে অসুবিধা হয় না, সময় নষ্ট হয় না। না হলে, নব্য চিকিৎসকদের দল রোগী দেখবে এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে তারা পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। সময় লাগতে পারে সঠিক চিকিৎসা পেতে। সিএমসি (খ্রিস্টান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল)-তে যে কোনও পরীক্ষানিরীক্ষার খরচ অত্যন্ত কম— অত্যন্ত উচ্চমানের রিপোর্ট।

হলদিবাড়ির এক স্কুল ছাত্রীর মা, সরকারি অফিসে কর্মরতা প্রীতিলতা কথা প্রসঙ্গে বললেন, তাঁর কন্যার সারা শরীর ক্রমশ ফুলতে থাকে, স্থানীয় চিকিৎসায় কাজ হয় না। তড়িঘড়ি বিমানে চেন্নাই, তারপর গাড়ি চেপে ভেলোর। টিকিট করা হল সিএমসি-তে। কয়েকজন জুনিয়র ডাক্তার দেখেছিলেন। কিন্তু তখনও বিশেষজ্ঞ কেউ দেখেননি। তখন মেয়েটি এমন ফুলে গিয়েছে যে, দেহ বসার চেয়ারে আটকে গিয়েছে। উপায় না দেখতে পেয়ে কন্যাকে নিয়ে অন্য এক হাসপাতালে তাড়াহুড়ো করে ছুটে যান। ওখানে একজন অত্যন্ত সহৃদয় চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যিনি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, এবং সময় নষ্ট না করে চিকিৎসা শুরু করেন। মাত্র দু'দিনের চিকিৎসায় প্রীতিলতার কন্যা অনেকটা সুস্থ হয়। ২৭ দিন পরে কন্যাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। এটা ২০১৬ সালের ঘটনা। এখনও বছরে কমপক্ষে তিনবার ভেলোরের ওই হাসপাতাল, যার নাম এসআরএম, সিআইএমএস-এ যেতে হচ্ছে। চিকিৎসক রামাকৃষ্ণন একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। তাঁর অধীনেই কন্যার চিকিৎসা চলছে।

প্রফেশনালিজমের সংজ্ঞা 'পয়সা বুঝে নেব এবং সঠিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করব।' বহুদিন ধরেই দক্ষিণ ভারতের এইসব হাসপাতালে 'ওয়ান আমব্রেলা' দর্শন মেনে সমস্তরকম পরিষেবা একই ছাদের তলায় পাওয়া যাচ্ছে। অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে না।

টেলিমেডিসিন প্রযুক্তির সাহায্যে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনা চলে। প্রয়োজনে সরাসরি টেলিফোনে কথা বলা যায়। প্রীতিলতা বলছিলেন, রামাকৃষ্ণন মনুষ্যরূপী ভগবান।

অরুণ ভট্টাচার্যর গল্পটা অন্যরকম। ছেলের চিকিৎসাকর জন্য সিএমসি ভেলোরে গিয়েছিলেন। একদিন নিজে গভীরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সরাসরি হাসপাতালে ভরতি হলেন। দ্রুত চিকিৎসা শুরু হয় এবং একটা বড় অপারেশন হয়। দশ দিন পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। অরুণের মতো এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা সিএমসি-র চিকিৎসার মান এবং পরিষেবাকে ভারতসেরা বলে থাকেন।

ভেলোরে চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে প্রচুর হোটেল, বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা এবং হোম টুরিজমের মতো পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। একই রকমভাবে অ্যাপোলো হাসপাতাল, শংকর নেত্রালয়, রামচন্দ্রন হাসপাতালকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের হোটেল এবং হোমস্টের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। হায়দরাবাদের চোখের হাসপাতাল এল ভি প্রসাদ বা রেড্ডি'জ হাসপাতালের সন্নিকটে, বেঙ্গালুরুতে নারায়ণ হৃদয়ালয়কে কেন্দ্র করে, সর্বোপরি দিল্লির এআইআইএমএস (এইমস)-এর আশপাশে রোগী এবং তার সঙ্গীদের থাকার জন্য নানা ব্যবস্থা গড়ে উঠছে।

কলকাতায় প্রাইভেট হাসপাতালগুলো সর্বদা রোগীদের প্রতি সদয় নয়। এমনকি বিলের টাকা না মেটানোয় মৃতদেহ আটকে রাখা, সামঞ্জস্যহীন বিল বানানো ইত্যাদি নানা অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওই কর্পোরেট কালচারের হাসপাতালগুলোর সিইও-দের ডেকে নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন সঠিক রাস্তায় চলতে। নতুন বিল এনে অব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে। তবে কলকাতার সব প্রাইভেট হাসপাতালকে একই সারিতে রাখা অনুচিত। অনেক হাসপাতাল যথার্থ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে চিকিৎসা করে। বর্তমানে বাইপাসের ধারে হাসপাতাল হাব তৈরি হয়েছে। বহু রোগী ও তাদের পরিবারের থাকার পরিকাঠামো, হোটেল, হাটবাজার গড়ে উঠেছে। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমি জেনেছি, কলকাতায় চিকিৎসকদের মেধা অতি উত্তম। কিন্তু অনেক সময় অযথা বিলম্ব বা একই ছাদের নিচে সব পরিষেবা পাওয়া যায় না। রোগীরা বিরক্ত হন। এখন কিন্তু কলকাতায় চিকিৎসাক্ষেত্রে কর্পোরেট কালচার, ঝাঁ চকচকে পরিকাঠামো সর্বোচ্চমানের। অনেক সময় দাদাগিরির দাপটে হাসপাতালগুলো অসুবিধায় পড়ে। এটা দেখা দরকার। ছোট শহরের প্রাইভেট হাসপাতাল ও নার্সিং হোমগুলো নিয়ে অনেক বড় আলোচনা আছে— পরে কোনও সময় বলব।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির বেশ কিছু সমর্থ মানুষ রোগীর এসকর্ট (সঙ্গী) হয়ে দক্ষিণের রাজ্যে যান— কেউ বা মুম্বইয়ে টাটা ক্যানসার সেন্টারে রোগী নিয়ে যান। তাঁদের থাকা ও খাওয়া রোগীকে বহন করতে হয়। তা ছাড়া দৈনিক মজুরি গড়ে পাঁচশো টাকা। অনেকে রোগীসেবায় পারদর্শী, স্যালাইন চালাতে জানেন, ইনজেকশন দিতে পারেন। তবে এঁরা সবাই প্রায় পুরুষ। আমি এই কাজে কোনও মহিলা নিযুক্ত আছেন বলে জানি না। অর্থের বিনিময়ে তারা যে পরিষেবা দেয়, তার মূল্য অপরিসীম। সর্বোপরি, কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

ডিবিআইটিএ-র সদর দফতর

ব্র্যান্ড ডুয়ার্স বাঁচিয়ে রাখতে আবেগ নয়, প্রয়োগে হতে হবে কঠোর বাস্তববাদি ও উৎপাদনমুখী

'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে ডিবিআইটি-র সচিব সুমন্ত্র গুহঠাকুরতার সঙ্গে সমস্যাজর্জরিত চা-শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেন **ভীষ্মলোচন শর্মা** তাঁর ধারাবাহিক প্রতিবেদনের **উনবিংশতম পর্বে**।

চায়ের ডুয়ার্স ডুয়ার্সের চা

১৮৭৮ সাল। ডুয়ার্স প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হল। ঠিক তার চার বছর বাদে ডুয়ার্সে ১৮৮২ সালে শুরু হল চা-চাষ। ডুয়ার্স প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশন স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে শুরু করল তার কাজকর্ম। মূল লক্ষ্য, বাগিচা মালিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে ডুয়ার্সের চা-শিল্পকে উন্নত করা এবং এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান দ্বিমুখী সত্তা নিয়ে কাজ করে যেতে লাগল। চা-বাগিচাশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাগিচা শ্রমিক নিয়োগ করা এবং তার জন্য আড়কাঠির মাধ্যমে বিহারের আদিবাসী উপজাতিদের ডুয়ার্সে আনয়ন করা ও পাশাপাশিভাবে যোগাযোগব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। এইভাবেই ডুয়ার্সে সম্প্রসারিত হল রেল যোগাযোগ, জলপাইগুড়ি টি টাউনে এল বিজলি বাতি এবং পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে এল টেলিফোনের সুবিধা। ১৯৫০ সালে ডুয়ার্স প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের শাখা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, বাগিচা মালিকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। তাদের যুক্তি ছিল, একটি পিতৃপ্রতিম সংগঠনের ছত্রছায়ায় থাকলে মালিকদের স্বার্থও সুরক্ষিত থাকবে। তখন থেকেই ডুয়ার্স প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশন ডুয়ার্স ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন নামেই পরিচিতি লাভ করে।

ডুয়ার্সের জনজীবন, বিশেষ করে চা-শিল্প এবং চা শ্রমিক নিয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে 'এখন ডুয়ার্স'-এর সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় ডিবিআইটিএ-র ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স শাখার সচিব সুমন্ত্র গুহঠাকুরতা, প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রুমা গুহঠাকুরতা এবং প্রখ্যাত লেখক বুদ্ধদেব গুহর বংশোদ্ভূত বনেদি রক্তের এই মানুষটিকে দেখলে কে বলবে, ১২৬টা চা-বাগানের প্ল্যান্টারদের যে সংগঠন, এই মানুষটি তার শীর্ষনেতৃত্ব? সদালাপী, হাসিখুশি, অত্যন্ত অমায়িক স্বভাবের মানুষটি প্রথমেই 'এখন ডুয়ার্স'-এর কর্মকাণ্ডের

ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং সাফল্য কামনা করলেন। প্রারম্ভিক সূচনায়

ডিবিআইটিএ-এর জন্মলগ্নের সময়কালের প্রেক্ষাপটে তিনি প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় স্বাধীন এবং সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান হিসাবে ডিবিআইটিএ-র ১৩৮ বছরের ইতিহাস তুলে ধরেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে।

বাগিচা, শিল্প এবং শ্রমিক নিয়ে 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে যে প্রশ্নগুলো করেছিলাম, সেগুলোর সব ক'টির উত্তর দেওয়ায় প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষনেতৃত্ব হিসাবে তাঁর যে আইনগত বাধা আছে, সে কথা স্বীকার করে অত্যন্ত বিনয় সহকারে সুমন্ত্রবাবু প্রশ্নগুলো ধরে ধরে জবাব দেবার চেষ্টা করলেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারের ভূমিকা শীর্ষক প্রশ্নের জবাবে তিনি নির্দ্বিধায় রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কিছু কিছু নীতির প্রশংসা করলেন। তাঁর মতে, 'বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত দায়িত্বসচেতন, কর্তব্যপরায়ণ। তিনি ছুটতে পারেন। তাই বারে বারে উত্তরবঙ্গে আসছেন, উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। ফলে পরিকাঠামোগত উন্নতি যে বিগত পাঁচ-ছয় বছরে দ্রুতগতিতে হচ্ছে— এটাকে অস্বীকার করা যায় না।' সুমন্ত্রবাবুকে প্রশ্ন করলাম, 'মমতা ব্যানার্জির মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়েই তো ডানকানসের বাগানগুলো একটার পর একটা বন্ধ হচ্ছে; অনাহার-দারিদ্র-অপুষ্টিতে মৃত্যু প্রতিনিয়তই, এবং প্রত্যেকটি বাগানই আপনার প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে?' জবাবে সুমন্ত্রবাবুর যুক্তি, 'দেখুন, আমি যখন চা-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হই, তখন ডানকানসের বাগানে কাজ শিখতে যেতে পারলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করতাম। পেশাগত কর্মসংস্কৃতি কাকে বলে, সেগুলো দেখা যেত ম্যাকলয়েড রাসেল, ডানকানস, গুডরিকসের বাগানগুলোতে। কেউ ধরে রাখতে পেরেছে? কেউ পারেনি। ডানকানসের অধিকাংশ বাগানই লক্ষ করে দেখুন অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকায়। বাগানগুলোতে শ্রমিক সমস্যা লেগেই থাকত বরাবর। ভীষণভাবেই এলাকাগুলো অনুন্নত, শিক্ষাদীক্ষার হার নেই বললেই চলে, এবং খুবই কঠিন পরিস্থিতিতে এগুলোকে চালাতে হত। ব্রিটিশ পিরিয়ডে যে সকল সাহেব ছিল, তারা কঠোর হাতে বাগানের পরিচালনব্যবস্থা দেখাশোনা করত। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, বিশেষত সাম্প্রতিককালে যে সকল ম্যানেজার আসছেন, তাঁরা শ্রমিকদের সমস্যাকে সামাল দিতে পারছেন না, এবং পর্বতপ্রমাণ চাপ সামলে বাগানও পরিচালনা করতে পারছেন না। তাই সমস্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে।'

দ্ব্যর্থহীনভাবে সুমন্ত্রবাবু জানালেন, বাগিচা সমস্যা মেটাবার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সর্বাত্মক কাজ চলছে। তাই প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্টের বিভিন্ন দিককে নতুনভাবে সরকারের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।' তুলনা দিয়ে তিনি বলেন, 'বর্তমানে ভারতীয় বাজারে দুই ধরনের মালিকপক্ষ চা উৎপাদন করছেন। একদল আছেন, যাঁরা সংগঠিত শিল্প অর্থাৎ যাঁদের প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্টের দায়বদ্ধতা মেনে কাজ করতে হয়। আর একদল আছেন, যাঁরা কোনও প্রকার দায়িত্বপালন এবং দায়বদ্ধতা পালন না করেই চা উৎপাদন করছেন। শ্রমিকদের প্রতি তাঁদের কোনও দায়দায়িত্ব নেই, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-র‍্যাশন-অ্যাম্বুলেন্স— কোনও খরচখরচা নেই। শুধু মজুরি দাও, পাতা তোলাও আর বটলিফ ফ্যাক্টরিতে পাঠিয়ে পয়সা গুনে নাও।' তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে সুমন্ত্রবাবু প্রমাণ করে দিলেন, যে পরিমাণ খরচ সংগঠিত শিল্পের মালিকদের শ্রমিকপিছু করতে হচ্ছে, সেই অনুপাতে চায়ের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়েনি। ফলে মালিক বর্ধিত মজুরি বা সুযোগসুবিধা দেবেন কীভাবে? সুমন্ত্রবাবুর মতে, ডুয়ার্সে ক্ষুদ্র চা-চাষিরা উৎপাদন করেছেন ৪৫৯.৭৯ মিলিয়ন কেজি চা, অন্য দিকে সংগঠিত মালিকপক্ষ উৎপাদন করেছেন ৫৮৩.৩২ মিলিয়ন কেজি চা। সর্বমোট ১০৪৩.১১ মিলিয়ন কেজি চা। শতাংশের হিসাবে সংগঠিত বাগিচাক্ষেত্র ৫৫.৯২ শতাংশ এবং ক্ষুদ্র চাষিরা ৪৪.০৮ শতাংশ। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বৃহদায়তন সংগঠিত বাগানগুলোর উৎপাদন ৭০০.১৯ মিলিয়ন কেজি এবং ক্ষুদ্র চা-চাষিদের উৎপাদিত চা ৫৫০.৩০ কেজি। মোট ১২৫০.৪৯ কেজি। শতাংশের হিসাবে সংগঠিত চা-বাগিচাক্ষেত্র ৫৫.৯৯ এবং ক্ষুদ্র চা-বাগিচাক্ষেত্র ৪৪.০১। এই তথ্য পরিসংখ্যান উল্লেখ করে সুমন্ত্রবাবুর যুক্তি, 'কোনও দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা ছাড়াই ক্ষুদ্র চা-শিল্প ব্যবসা করছে, আর বৃহদায়তন সংগঠিত চা-বাগিচাক্ষেত্রে আরও দায় চাপিয়ে দেওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্টের নতুন করে সংস্কার করে ম্যানেজমেন্টের ঘাড়ে দায় না চাপিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য এই দায়কে ভাগাভাগি করে নিলেই ধুঁকতে থাকা চা-বাগিচাগুলোতে আবার হাসি দেখা দিতে পারে।'

> 'চায়ের দাম ওঠানামা করে। কয়লা বা ইলেকট্রিকের মাশুল কিন্তু বাগান ম্যানেজমেন্টের হাতে নেই। ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন ব্যয়ের ৬০ শতাংশ খরচ হচ্ছে শ্রমিকদের লেবার অ্যাক্টের সুপারিশগুলো মেটাতে।

রাজ্য সরকারের র‍্যাশনিং নীতিকে সমর্থন করে সুমন্ত্রবাবু জানান, 'বন্ধ বাগানগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে রাজ্য সরকারের র‍্যাশনিং ব্যবস্থা। অন্যান্য বাগিচাক্ষেত্রেও শ্রমিক র‍্যাশনের মাধ্যমে গম বা চালের বরাদ্দ পাচ্ছে।' কীভাবে দেওয়া হচ্ছে জানতে চাইলে সুমন্ত্রবাবু জানান, 'বাগানে একজন শ্রমিক দৈনিক ১৩২.৫০ টাকা হিসাবে মজুরি পান। পাশাপাশি র‍্যাশনে পান পরিবারপিছু সপ্তাহে ৩৫ কেজি চাল অথবা গম। খোলা চা-বাগানের শ্রমিকরা ২৭ কেজি চাল বা গম পান ৪০ পয়সায় এবং বাকি আট কেজি ২ টাকা কেজি দরে। অধিকাংশ খোলা বাগানেই ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে চাল বা গম সরবরাহ করা হয়। কেবলমাত্র বন্ধ বাগানে এই সরবরাহ হয় সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে।' তবে বাগানে র‍্যাশন বণ্টনে যে সমস্যা হচ্ছে এবং কিছু কিছু মালিক যে রাজ্য সরকারের খাদ্যসুরক্ষা নীতির অপব্যবহার করছে, সে কথাও প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন সুমন্ত্রবাবু।

শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কী হতে পারে— এই প্রশ্নের উত্তরে সুমন্ত্রবাবুর মত, 'প্রত্যেকটি লেবার লাইনের বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছানো আশু প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের উদ্যোগে বাগিচায় পাম্প হাউস করে এই ব্যবস্থা রূপায়িত করলে মালিকপক্ষের অনেকটাই সুরাহা হয়।' সুমন্ত্রবাবু ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'বাগিচায় ইলেকট্রিসিটির বাণিজ্যিক হারে চড়া মাশুল নেওয়া হচ্ছে। কিছু মাশুল ছাড় সরকার দিতেই পারে। খরচ কমলে মালিকপক্ষ নিশ্চয়ই শ্রমিকদের স্বার্থে প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্টের প্রয়োজনীয় দিকগুলো বাস্তবায়িত করতে পারবেন।' সুমন্ত্রবাবু মনে করেন, 'শ্রমিকদের শৌচাগার স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা যায়, এবং এ ক্ষেত্রে সরকার-মালিকপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট বাগানগুলোর শ্রমিক নেতারা একযোগে দরবার করলে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের সহায়তায় পঞ্চায়েতগুলো এই কাজে সক্রিয় হতে পারে। বাগিচা শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় সমস্যা অবিশুদ্ধ পানীয় জলপান, যার ফলে ডায়ারিয়া, আমাশা, লিভারের রোগ, এমনকি

ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। কাজেই এই সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের মালিকদের পাশে একটু সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে দাঁড়ানো প্রয়োজন। এতে শ্রমিক-মালিক উভয়েরই স্বার্থ সুরক্ষিত হতে পারে।'

বাগিচার রাস্তাঘাট-শ্রমিক আবাসনের ব্যাপারেও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রাজ্য সরকার বাস্তবায়ন করতে পারেন বলে মনে করেন সুমন্ত্রবাবু। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, 'খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ২ টাকা কেজি দরে চাল সরবরাহ করছে। বাগিচা শ্রমিক প্রত্যেক পরিবারপিছু ৩৫ কেজি চাল বা গম পান। ২৭ কেজির জন্য শ্রমিকের বরাদ্দ ৪০ পয়সা। বাকি পয়সা ভরতুকি দেন মালিকপক্ষ। বাকি ৮ কেজি শ্রমিক ২ টাকা কেজি দরে কেনে। খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্প হওয়ার আগে মালিকদের ১১/১২ টাকা কেজি দরে চাল কিনতে হত। এখন অনেক অর্থসাশ্রয় হচ্ছে। র‍্যাশন আসার আগেই বাগিচা কর্তৃপক্ষ র‍্যাশনের জন্য সাবডিভিশনাল কন্ট্রোলারের কাছে অগ্রিম অর্থ পাঠিয়ে দেন। কন্ট্রোলার অফিস থেকে র‍্যাশন চলে আসে গাড়িতে বাগানের গোডাউনে। বাগানের নির্দিষ্ট র‍্যাশন বন্টনের দিনে র‍্যাশনবাবু শ্রমিকদের বরাদ্দ র‍্যাশন প্রদান করেন। কোনও বাগানে ১৫ দিনে বা কোনও বাগানে মাসে একবার— যাঁর যেরকম সুবিধা, সেভাবে র‍্যাশন বন্টন হয়। ফলে খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা যদি মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকপক্ষ উভয়েই পেতে পারেন তাহলে গীতাঞ্জলি প্রকল্প, অন্ত্যোদয় যোজনা প্রকল্প, বন্ধ বাগিচায় ফাউলাই প্রকল্পের মতো স্বচ্ছ ভারত মিশন বা মিশন নির্মল অভিযান প্রকল্পগুলোও তো বাগিচা শ্রমিকদের স্বার্থে গ্রহণ করা যেতে পারে।'

বাগিচার রাস্তাঘাটের কথা বলতে গিয়ে ডিবিআইটিএ-র অন্যতম সংগঠক মনে করেন, প্রত্যেকটি চা-বাগিচার মধ্যবর্তী আটারি রোডগুলো পাকা এবং ন্যূনতম চওড়া হওয়া প্রয়োজন। এর ফলে যাতায়াত সহজসাধ্য হবে। ম্যানেজার এবং সহকারী ম্যানেজাররা খুব সহজেই ডিভিশনে গিয়ে কাজকর্ম তদারকি করতে পারবেন। অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে প্রতিটি বাগিচায় স্ট্রিটলাইট থাকলে ভাল হয়।' গ্রুপ হসপিটালের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সুমন্ত্রবাবু মনে করেন, প্রতিটি বাগিচায় এমবিবিএস ডাক্তার এবং ট্রেন্ড নার্স ও কম্পাউন্ডার থাকা অন্যতম আবশ্যিক শর্ত হওয়া প্রয়োজন। ডাক্তার, নার্স এবং কম্পাউন্ডার অবশ্যই নিয়োগ করবেন বাগিচা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু জীবনদায়ী ন্যূনতম দামবিশিষ্ট ওযুধপত্র বা ওআরএস বা ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল ইত্যাদি সুলভ মূল্যে স্বাস্থ্য দপ্তর সরবরাহ করতে পারে।' সুমন্ত্রবাবুর প্রশ্ন, 'যেসব বাগিচায় ডাক্তার বা নার্স বা কম্পাউন্ডার আছে, তেমন বাগানের সংখ্যা কম নয়। অথচ আজ থেকে ১০ বছর আগে ওষুধের যা দাম ছিল, আজ সেই দাম ২০০-৩০০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। বাজারে সেই অনুপাতে চায়ের দাম বেড়েছে কি? তাহলে টি প্ল্যান্টেশন অ্যাক্ট যুগোপযোগী হওয়া প্রয়োজন, অথবা সরকারের নৈতিকভাবেই প্ল্যান্টেশন টি অ্যাক্টের সুপারিশগুলো ন্যূনতম ভিত্তিতে বাগিচায় প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।' মন্তব্য সুমন্ত্রবাবুর।

ডানকানসের বন্ধ চা বাণিজ্যগুলোর ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই কার্যত সুমন্ত্রবাবু একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সুমন্ত্রবাবুকে সরাসরি প্রশ্ন করি, 'শোনা যায়, ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগিচার শ্রমিকদের পিএফ এবং গ্র্যাচুইটির টাকা গোয়েঙ্কারা নাকি উত্তরপ্রদেশের একটি ইউরিয়া কারখানায় বিনিয়োগ করেছিল, এবং ফ্যাক্টরি না চলায় সেই ক্ষয়ক্ষতি ডানকানসরা আজ পর্যন্ত মেটাতে পারেনি বলেই ডুয়ার্সের বাগানগুলো বন্ধ?' সুমন্ত্রবাবু জবাবে জানান, 'অনেকের কাছ থেকেই তিনি অনেক কিছু শুনেছেন। কোনওটার বাস্তব ভিত্তি আছে, অনেকটারই নেই।' সুমন্ত্রবাবুর মতে, 'ডানকানদের সমস্যা অন্য রকমের। বাগানগুলোর অধিকাংশই গত শতাব্দী বা তারও আগের। দামি দামি মেশিন, দুর্দান্ত ফ্যাক্টরি বিশাল মাপের। সাহেবরা কঠোরভাবে প্রশাসন চালাত। সকলেই ভয়ে তটস্থ থাকত। ছবির মতো ছিল ডানকানসের বাগানগুলো। কিন্তু সাম্প্রতিককালে মুষ্টিমেয় কিছু শ্রমিকের ফাঁকিবাজি, ঔদ্ধত্য এবং অরাজকতার কারণে বৃহৎ অংশের শ্রমিক কষ্টে আছে।' তুলনা দিয়ে সুমন্ত্রবাবুই বলেন, 'আপনি বলুন তো, গয়েরকাটা, দিয়াবাড়ি, কুর্তি, ভগৎপুর, জিতি, নাগরাকাটা, গ্যান্দ্রাপাড়া, লক্ষ্মীপাড়া, হোপ, অ্যান্ড্রু ইউলের বাগানগুলো চলছে কেমন করে? কারবালা, বানারহাট, নিউ ডুয়ার্স, চুনাভাটি বাগানগুলো দেখুন। শান্তিপূর্ণ শ্রমিক, সহানুভূতিশীল এবং দায়বদ্ধ মালিকপক্ষ, বুঝদার শ্রমিক নেতা— সকলের সহযোগিতা আছে। কারবালা, বানারহাট ইত্যাদি বাগিচাগুলোতে মুসলিম, নেপালি, আদিবাসীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। কিন্তু মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে বা কালচিনি ব্লকের চা-বাগিচাগুলোতে জনবিন্যাস ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে কিছু সমস্যা ডানকানসকে দীর্ঘদিন ধরেই চিন্তায় রেখেছে। বাগানে শেড ট্রি কেটে নেওয়া, কাজে ফাঁকিবাজি, কাজের সময় নেশা করে চিৎকার-চেঁচামেচি করা, ম্যানেজারকে হুমকি, দলগাঁওতে ম্যানেজার খুন পর্যন্ত হয়ে গেলেন বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে গিয়ে। ফলে ডানকানসের বাগানগুলোকে নিয়ে মালিকগোষ্ঠী, সরকার, শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ— সকলকেই কঠোর এবং বাস্তববাদী হতে হবে।

সরকার যে বিভিন্ন বোর্ড গঠন করছে, যেমন আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য বোর্ড, লেপচা বা তামাং বা বিভিন্ন জনজাতির জন্য বোর্ড, তাতে কোনও উন্নতি হচ্ছে কি না— এই প্রশ্নের উত্তরে সুমন্ত্রবাবু কিছু সমস্যার জায়গা চিহ্নিত করেন। সুমন্ত্রবাবুর মতে, 'উদ্যোগ ভাল, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভীষণ সতর্ক হতে হবে। সঠিকভাবে প্রয়োগ না হলে বুমেরাং হতে পারে। এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রয়োজন। ধরা যাক, চা-বাগিচার জমি রাজ্য সরকারের। বাগান ৩০ বছরের জন্য লিজ নিল। বাগিচায় আদিবাসী, নেপালি, তামাং, লেপচা

ডিবিআইটি-র সচিব সুমন্ত্র গুহঠাকুরতা

জনজাতির মানুষ বসবাস করেন। ধরা যাক, পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গীতাঞ্জলি প্রকল্পে বাড়ি হবে। বাগিচা এনওসি দিল। প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতেই শ্রমিকরা বাড়ি পেল। কিছুদিন পর তামাং বোর্ডের জনপ্রতিনিধি গিয়ে বলল, বোর্ড থেকে টাকা পাওয়া গিয়েছে। বাগিচায় শ্রমিক আবাস বানাতে চাই। বিডিও-দের উপর চাপ সৃষ্টি করা হল। হয়ত লেপচা বা তামাং বোর্ডের টাকায় জেলা প্রশাসন বাগানের সংশ্লিষ্ট জনজাতিদের কোয়ার্টার বানিয়ে দিল। কিন্তু ওই বাড়ি তো চা-বাগিচা বা রাজ্য সরকারের সম্পত্তি হিসাবে থাকল। পরবর্তীকালে চা-বাগান যদি না থাকে বা সরকার যদি সংশ্লিষ্ট জমিতে অন্য কোনও উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে, তখন ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থেকে যেতেই পারে।' তাই সুমন্ত্রবাবুর যুক্তি, দলমত নির্বিশেষে চা-শিল্পকে বাঁচাতে গেলে বাগিচার স্বার্থে কোনও প্রকার সমঝোতা না করে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আর্থ-সামাজিক অবস্থা আগে বদলানো প্রয়োজন।

সুমন্ত্রবাবুর মতে, শ্রমিকদের মজুরি প্রয়োজন। কিন্তু আন্দোলন বা গেট মিটিং করে, কামকাজ বন্ধ রেখে আন্দোলন করলে সংশ্লিষ্ট বাগিচার উৎপাদনই মার খাবে। কেন্দ্রীয় স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে মালিকপক্ষ বা সরকারের যৌথ দর কষাকষি চলছে। '৬৬ সালে ওয়েজ বোর্ড তৈরি হয়েছিল। মিনিমাম ওয়েজ নিয়ে কোনও দিন কোনও স্তরেই আলোচনা হয়নি। বিগত দিনে প্রাইস ইনডেক্স বা মুদ্রাস্ফীতির বর্ধিত রূপ ঠিক কোন পর্যায়ে, সেটা দেখা হত। কেন্দ্রীয় শ্রমিক নেতারা শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ ছিলেন। আলাপ-আলোচনা চলত। অবশেষে তিন বছরের জন্য উভয় পক্ষের যৌথ সম্মতিতে একটা সমঝোতা হত। সুমন্ত্রবাবুর মতে, 'চায়ের দাম ওঠানামা করে। কয়লা বা ইলেকট্রিকের মাশুল কিন্তু বাগান ম্যানেজমেন্টের হাতে নেই। ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন ব্যয়ের ৬০ শতাংশ খরচ হচ্ছে শ্রমিকদের লেবার অ্যাক্টের সুপারিশগুলো মেটাতে। ফলে উৎপাদন ব্যয় যেভাবে বছর বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেভাবে চায়ের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বাগান পরিচালক বা ম্যানেজাররা সবসময়ই গুণগতমানসম্পন্ন চা উৎপাদন করতে চান। তাই সেটা করতে গিয়ে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। ১৪০-১৬০ টাকা সাধারণ চা তৈরি করার উৎপাদন ব্যয় যদি হয়, বাজারে ২৫০-৩০০ টাকায় ওই চা বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতা বাড়তি দামে চা ক্রয় করছে, অথচ বাগান ন্যূনতম উৎপাদন ব্যয়ও পাচ্ছে না। বাগানের প্রাপ্ত অর্থ আর বাজারের চায়ের বিক্রি বাবদ দাম— এই মধ্যেকার গ্যাপকে কমানোর জন্য সরকারের উদ্যোগগ্রহণ একান্তই প্রয়োজন।' বাগানে অর্থ আসছে না। ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের টাকা দিতে পারছে না। সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক বাগান আছে, যারা নিজেরা প্যাকেট টি করছে। কিন্তু যারা অকশনের উপর নির্ভরশীল, তাদের অবস্থা শোচনীয় বলেই অভিমত সুমন্ত্রবাবুর।

বর্তমানে ডিবিআইটিএ-র ছত্রছায়ায় ১২৬টা চা-বাগান। ডুয়ার্সের প্রায় ৬০ শতাংশ চা-বাগান এই সংগঠনের সদস্য। প্রায় ৯২.৮৭ হাজার হেক্টর অঞ্চলব্যাপী এর কর্মকাণ্ড, ১.৪ লাখ শ্রমিক তাঁদের পরিবারবর্গ নিয়ে বাগানগুলোতে কর্মরত। প্রায় ৪.৭৪ লাখ শ্রমিক পরিবারের সদস্য-সদস্যা বাগানের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এই শিল্প শুধুমাত্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগই সৃষ্টি করে দিচ্ছে না, পাশাপাশিভাবে শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারবর্গের বাসস্থান, চিকিৎসা, র‍্যাশনিং ব্যবস্থা, জ্বালানি, প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিনোদনের বিরাট বড় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে, যাকে সামনে থেকে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে ডিবিআইটিএ। চা-বাগিচা শিল্পে শ্রমিকের বিরাট গুরুদায়িত্ব আছে। সুতরাং একটা চা-বাগিচার উন্নতি এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেটিকে গড়ে তুলতে গেলে 'ম্যান ম্যানেজমেন্ট' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। একজন বাগিচা ম্যানেজারের কর্মকাণ্ড নির্ভর করে, সে কতটা তার শ্রমিকদের চা-চাষ এবং উৎপাদনে নিযুক্ত করতে পারছে, তার উপর। সরাসরি চা-চাষ, চা প্রস্তুত, সম্পদ সৃষ্টি, উন্নয়নমুখী দায়িত্ব বর্তায় একজন ম্যানেজারের উপর। তাই বাগিচা পরিচালকবর্গকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য এবং কঠিন পরিস্থিতি থেকে বাগানকে বার করে আনার জন্য যে প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রয়োজন তা ডিবিআইটিএ করে থাকে।

ডিবিআইটিএ সচিব সুমন্ত্র গুহঠাকুরতা অত্যন্ত আশাবাদী চা-শিল্পে সমস্যা কাটার ব্যাপারে। তিনি তাই আশাবাদী হয়েই বলেন, 'বিগত দিনেও চা-শিল্পে সমস্যা ছিল। চা-শিল্পের সমস্যা নতুন নয়। সরকারও পরিকল্পনা করেছে, নীতিনির্ধারণ হয়েছে, প্রয়োগ হয়নি। কিন্তু পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেটাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য বর্তমানে রাজ্যস্তরে টি অ্যাডভাইসরি কমিটি শিল্পের ক্ষেত্রে নবদিশা আনতে নিত্যনতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং সঠিক পথে এগচ্ছে। বারে বারে অভিজ্ঞ এবং বর্ষীয়ান মন্ত্রীরা বসছেন, চা-শিল্পের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ওতপ্রোতভাবে, তাঁদের ডাকা হচ্ছে, ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে তাঁরা বসছেন, তাঁদের সঙ্গে সিসিপিও অর্থাৎ কনসালটেটিভ কমিটি অব প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশনের কনভেনার বা সদস্যরা বসছেন, বিভিন্ন ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঘন ঘন মিটিং করছেন।' সম্প্রতি টি অ্যাডভাইসরি কমিটিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গৌতম দেবের মতো অভিজ্ঞ মন্ত্রীর উপরই ভরসা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। সুমন্ত্রবাবু মনে করেন, প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্টকে বাস্তবোপযোগী করে এর সংশোধন হওয়া খুবই জরুরি। দিল্লিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে এবং এই অ্যাক্টের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়ে একটা যৌথ সিদ্ধান্তে কেন্দ্র এবং রাজ্য আসবে বলেও আশাবাদী সুমন্ত্রবাবু। তিনি মনে করেন, যৌথ দর কষাকষির মধ্যে দিয়ে মুদ্রাস্ফীতির হারের দিকে লক্ষ্য রেখে যতদিন না ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারিত হয়, ততদিন পর্যন্ত 'ইনটেরিম রিলিফ' দিলে আপত্তি নেই। এই রিলিফ তিন বছর হতেই পারে। ডিবিআইটিএ-র মিনিমাম ওয়েজেও আপত্তি নেই বলে মনে করেন সুমন্ত্রবাবু। তবে মিনিমাম ওয়েজের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত বেঁধে দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি।

১) কাজের সময়সীমার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে হবে। পিক সিজনেও এক বেলা কাজ করার যে রীতি চলছে, সেটার পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

২) পিক সিজনে ফেস্টিভ্যাল হলিডে অর্থাৎ ফাগুয়া পরব, করমব্রত বা অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে ছুটি না নিয়ে সেই ছুটি অফ সিজনে নেওয়ার বিধি চালু করা প্রয়োজন।

৩) উৎপাদনের উন্নতিকরণের ক্ষেত্রে বাগানের প্রত্যেকটি শ্রমিক সংগঠনের ইউনিটকে নিয়ে বসে বাগানের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে ধরে ধরে স্টাডি করে শ্রমিকদের কর্মক্ষমতার 'এনার্জি লেভেল'কে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যবহার করে উৎপাদনকে আরও বৃদ্ধি করার দিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে বলে মনে করেন সুমন্ত্রবাবু।

৪) পিক সিজনে 'টাস্ক ওরিয়েন্টেড' এবং 'ওভারটাইম' বা 'ইনসেনটিভ' ওরিয়েন্টেড কাজ করানোর উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন সুমন্ত্রবাবু। অর্থাৎ ২২ কেজির উপরে পাতা হলে প্রতি কেজিতে ইনসেনটিভ, আরও বেশি হলে আরও ইনসেনটিভ নীতি চালু করলে কোম্পানি লাভবান হবে।

দ্রুততার সঙ্গে চা-শিল্পের সংকটমোচন চান সুমন্ত্রবাবু। আবার বাগিচাগুলোতে ফাগুয়া পরব, দুর্গা পুজো, দশেরায় আনন্দে মেতে উঠবেন শ্রমিকরা। বানারহাট, বিন্নাগুড়ি, বীরপাড়া, কালচিনি, জলপাইগুড়িতে বাজার জমজমাট হয়ে উঠবে। চা-শিল্পের অন্ধকার দশা থেকে আলোর অভিমুখে যাত্রা শুরু হবেই হবে। আর এ যাত্রায় পথ দেখাবে কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়— এমনই আশা সুমন্ত্রবাবুর।

উড়িষ্যা থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

ডিমগুলো সব এক বাক্সে না রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজীব গান্ধি। যুব কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির নিয়ে হরেক অভিজ্ঞতা স্মৃতিচারণের ফাঁকে লেখক এখনও মনে করতে পারছেন সে পরামর্শের গুরুত্ব। কিন্তু প্রিয়দার সঙ্গে এক থালায় ভাত খাওয়া মানুষ মোটেই প্রতিযোগিতায় হারতে চায় না। ওদিকে আবার প্রশিক্ষণ চলাকালীন হাজির হলেন ইন্দিরাজি। তাঁকে একটু বেশি হাঁটতে হল, কিন্তু তাঁর অসুবিধে হয়নি। সমস্যায় পড়েছিল তাঁর নতুন জুতোটা। ইতিমধ্যে যুব সভাপতি নির্বাচনের সময় এসে গিয়েছে। লেখক আছেন সে দৌড়ে। তারপর কী হল?

।।৩৫।।

যুব কংগ্রেসের ট্রেনিং প্রোগ্রাম আমার কাছে এক সুখস্মৃতি। আমার মনে হয় না, এমন পেশাদারি দক্ষতা নিয়ে কংগ্রেস দলে অতীতে কোনও প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে। কারণ দলের পক্ষে আর একটি ডি. পি. রায় পাওয়া কঠিন নয়, কিন্তু আর একবার সেই ছেলেগুলিকে পাওয়া যাবে না। বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে স্রেফ মাঙ্গলিক ক্রিয়ার ছুটি নিয়ে আবার মুণ্ডিত মস্তকে এসে ক্যাম্পে যোগ দিয়েছে প্রকাশ আগরয়াল। ফিল্ড অ্যাসাইনমেন্টের কাগজ হাতে নিয়ে রওনা হওয়ার দিনে শুনছে বাড়িতে নবজাতক সন্তানটি সাতদিনের মাথায় মৃত্যুবরণ করেছে (গোলাম আহমেদ মীর) কিন্তু তখনও দায়িত্ব পালনের প্রশ্নে পিছিয়ে যায়নি। আর এমন নিখুঁত পরিকল্পনা নিয়ে কোনও দিন নামার কথা কেউ আগে কখনও ভাবেনি।

একটা প্রোগ্রাম ঘিরে আলাদা একটা অফিস। সেন্ট্রাল মনিটারিং সেল। যেখানে প্রতিটি জেলা থেকে আসা রিপোর্ট প্রসেস করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হচ্ছে। আর ছেলেরা ঠিক রিপোর্ট দিচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য তরুণ এম. পি.-দের নিয়ে গঠিত মনিটারিং ইউনিট। তারা জেলাগুলির পর্যবেক্ষণ করে তাদের আলাদা রিপোর্ট দলকে দিচ্ছে এবং তার ভিত্তিতে যারা প্রোগ্রামের দায়িত্বে আছে, তাদের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন হচ্ছে তাদের জানতে না দিয়ে। কাজগুলি ধাপে ধাপে হত। ছেলেরা নতুন জেলায় গিয়ে জেলার একটা প্রোফাইল পাঠাত। তার ইংরেজির প্রতিশব্দ ছিল, ফ্যামিলারাইজেশন। তারপর জেলা থেকে ৩০ জন ছেলেকে নির্বাচিত করে একটা কোর গ্রুপ তৈরি হত, তার নাম মোটিভেশন। কারণ ৩ দিনের শিবির করে তাদের মোটিভেট করা হত, সঙ্গে থেকে ২০ দফা রূপায়ণে পিয়ার গ্রুপ হিসাবে কাজ করবে বলে। এবার ১৫ জন করে দু'টি দলে বিভাজিত হয়ে জেলার দরিদ্রতম ব্লকগুলিকে বাছা হত ইমপ্লিমেনটেশন-এর কাজ করবার জন্য। এই এলাকাটির কর্মসূচির পরিভাষায় পরিচয় ছিল 'ক্লাস্টার' বলে।

প্রথম ও চতুর্থ ব্যাচটিকে নিয়ে কোনও প্রব্লেম হয়নি। কারণ সবাই হিন্দি ভাষী। এবং মূলত উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল, জম্মু ও কাশ্মীর, গুজরাট— সবাই হিন্দি বলতে বা বুঝতে পারাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যম নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি, আর পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতেও কোনও সমস্যা হয়নি।

বস্তুত সমস্যা শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় ব্যাচ থেকে। সে গল্প আগেই শোনানো উচিত ছিল। এটা ছিল দক্ষিণ ভারতের ৪টি রাজ্য নিয়ে। আমরা যদিও মনে করি দক্ষিণের লিঙ্ক ল্যাংগোয়েজ ইংরেজি, তা কিন্তু শহরের শিক্ষিত লোকদের জন্য। একটু গ্রামীণ এলাকায় গেলে তারা নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু না বলতে পারে, না বুঝতে পারে। আরও একটা সমস্যা হল, শীত ছিল, তাই তালকাটোরার বেসমেন্টে ছেলেরা থাকতে পেরেছে। কিন্তু মার্চ-এপ্রিলের গরমে তো সেটা সম্ভব নয়। তাই শিবিরের স্থানও বদলাতে হল। এবার চলে এলাম জহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামের হোস্টেলে। একটা অংশে সাইয়ের প্রশিক্ষণার্থীরা ছিল। আর একটা অংশ আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় ক্যাম্পের যখন প্রস্তুতি চলছিল তখনই রাজীবজি বলেছিলেন, 'ডি. পি., এরপর কা'কে দিয়ে ট্রেনিং করাবে?' আমি বলেছিলাম, 'কেন? ম্যাডাম বোলার তো ভাল সামলেছেন। উনিই করবেন।' রাজীবজির প্রতিক্রিয়া ছিল, 'তোমার যদি তাই মনে হয়, তো আমি কিছু বলছি না। তবে, ডোন্ট পুট ইয়োর এগস ইন ওয়ান বাস্কেট,' কথাটা যে কত মূল্যবান ছিল, তা বুঝতে যে আমার সময় লাগেনি সে কথা আগেই শুনিয়েছি।

জায়গা নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। ছেলেরাও আসার সম্মতি জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে, আর কে কোন বিষয়ে পড়াবে তা তো ঠিক হয়েই আছে। তবে ছেলেদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল 'বিহেভিওরাল সাইন্স'-এর ক্লাসটা। যখন রোল প্লে করাত, তখন সবাই যেন নিজের রাজনৈতিক পরিচয় ভুলে গিয়ে এক নতুন পরিচয় নিয়ে উঠে আসত— এটা 'অ্যাকর্ড' বলে একটা প্রোফেশনাল গ্রুপ সঞ্চালন করত, যদিও কর্মসূচিটি ব্যয়বহুল ছিল। কারণ, ম্যাডাম এক একটা প্যাকেজের জন্য সেই আমলে দেড় লক্ষ টাকা করে নিতেন। তার ভেতর অবশ্য ফ্যাকাল্টিদের পেমেন্টটা ধরা থাকত।

আমার আস্তে আস্তে মনে হচ্ছিল যে ছেলেদের ভেতর আমার পপুলারিটি ওনার

ভাল লাগছে না। কারণ ছেলেরা যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্যের বাইরে যেতে রাজি হচ্ছে তাতে কার প্রভাব বেশি কাজ করছে, ওনার না আমার। আমি যেন বেশ বুঝতাম, পড়ানো নয়, একজন যুব কংগ্রেসের জাতীয় স্তরের নেতা একসাথে ড্রিল করছে, দৌড়াচ্ছে, আবার ক্লাস করছে, আবার রাত হলে সবাইকে শুইয়ে নিজে তাঁবুতে শুচ্ছে, এটা ওদের কাছে একটা অভিনব অভিজ্ঞতা ছিল। তার ফলে ওরা 'দাদা অন্ত প্রাণ' হয়ে উঠত। ম্যাডাম বোলারের এই প্রবণতাটা বোধহয় ভাল লাগেনি। উনি তাই দ্বিতীয় ক্যাম্পে নিজে অ্যাকাডেমিক বিষয়টা বাদ দিয়েও ছেলেদের সাথে আমার প্রতিযোগী হয়ে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু আমি প্রিয়দার সাথে একথালে ভাত খাওয়া লোক। আমি সে প্রতিযোগিতায় হারব কেন? বরং ওনাকেই, রাজীবজিকে চিন্তে ভুল করাতে, মাঝপথে চলে যেতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় ক্যাম্পে ব্যবস্থাজনিত একটা সমস্যাই ছেলেদের ভাষার ব্যারিকেড ভেঙে আমার ভেতরের মানুষটাকে চিনিয়ে দিয়েছিল। স্টেডিয়ামের ঘরে ঢুকে যখন ছেলেরা বাথরুমে হাত পা ধুতে গিয়েছে, তখন দেখা গেল, কোনও বাথরুমে জল নেই। তৎক্ষণাৎ হৈ চৈ, চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি এম.সি.ডি.-কে ফোন করে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের ট্যাঙ্কার পাঠাতে বললাম। জল তো এল, কিন্তু নীচ থেকে তিন তলায় তুলবে কে? আমি কাউকে কিছু না বলে সামনে যে ঘরটি ছিল সেই ঘরের বাথরুম থেকে দুটো খালি বালতি হাতে নিয়ে নীচে নেমে গেলাম। এবং জল ভরে নিয়ে এসে ওই বাথরুমে রেখে দিলাম, কিছু ছেলে 'হাঁ হাঁ' করে উঠল। বুঝলাম, ওরা লজ্জা পেয়েছে। তারপর সার বেঁধে সবাই যার যার ঘরের বাথরুম থেকে বালতি বের করে জল নিয়ে এল। তারপর আমাকে বুঝতে ওদের আর কোনও অসুবিধা হয়নি।

দক্ষিণের গ্রুপ বলে বোলার ম্যাডামের একটা অ্যাডভানটেজ ছিল। উনি নিজেও কর্ণাটকের হওয়াতে একটা ব্যাচের সাথে মাতৃভাষায় কথা বলতে পারছিলেন, কিন্তু ওদের ইংরেজিতে দখল এত কম ছিল যে আমার পক্ষে কমিউনিকেট করাই প্রব্লেম হয়ে গিয়েছিল। তবুও ভাষা যে বড় প্রতিবন্ধক নয় সেটা ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম। এই শিবির চলাকালীনই সঞ্জয়জির মৃত্যুবার্ষিকী ছিল। ২৩ জুন। আমি ছেলেদের ড্রিলের পোশাকে সমাধিতে নিয়ে গিয়ে সবাইকে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। রাজীবজি এসে দেখবেন। রাজীবজি দেখলেন। এবার ওদের পাঠিয়ে দিয়ে আমি পাশের আই পি স্টেডিয়ামে রক্তদান শিবিরে গিয়েছি। রাজীবজি মঞ্চ থেকে হাত নেড়ে ডেকে বললেন, 'ডি. পি., এক্ষুনি ক্যাম্পে যাও, ইন্দিরাজি আসছেন।' আমি তো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট শেষ করিয়ে সবাইকে ক্লাসরুমে বসিয়ে নীচে দাঁড়িয়ে আছি, ম্যাডাম আসবেন। এভাবেই প্রথম ক্যাম্পেও একদিন সন্ধ্যাবেলা রাজীবজি ইন্দিরাজিকে নিয়ে তালকাটোরা স্টেডিয়ামে এসেছিলেন।

এবারে এলেন সকালে। আমি তাড়াহুড়োয় ওনাকে ২৬ নং গেটের বদলে ২৪ নং গেট দিয়ে তুলেছি। ফলে, করিডোর দিয়ে অনেকটা হাঁটতে হচ্ছে। আমি লজ্জায় জড়োসড়ো। শঙ্কিত গলায় ভুল স্বীকার করে নিয়ে যখন ব্যাপারটা নিয়ে উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করছি, ইন্দিরাজি বললেন, ইসমে মেরা কোই পরেশনি নেহি হোতি হ্যয়। লেকিন জুতি নয়া হ্যয় না, ওহ্ চুপ রহি হ্যয়। যাই হোক, উনি হলে এসে পৌঁছোবার পর আমি আবার আমার কেরামতি দেখিয়ে সকলের নাম, রাজ্য ও জেলা বলে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে প্রথম ক্যাম্পের ছেলেদের পাঠানো ফিল্ড রিপোর্ট ভায়া পিএমও, ইন্দিরাজির কাছে পৌঁছোতে শুরু করেছে, যা একবার আমাকে অর্জুন সেনগুপ্ত সাহেব প্রণবদার বাড়িতে জানিয়েছিলেন।

রাজীবজি যখন নামলেন, ওনার সাথে সীতারাম কেশরীও এলেন। আমি প্রমাদ গুনলাম। এক, উনি আমাকে ঘোর অপছন্দ করেন। দুই, উনি তারিককে অতিশয় পছন্দ করেন।

এই সময়টাতে স্টিফেন সাহেব দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ওনার আমার কাজ খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। আমার নিজের বয়স তখন বত্রিশ। আমি যখন 'মাই বয়েজ' বলে বলতাম, উনি খুব মজা পেতেন।

একদিন অরুণ নেহেরু এসেছেন সারপ্রাইজ ভিজিট দিতে। ২৪ নং গেটের কাছে সাইয়ের মেয়েরা তখন ভলিবল খেলছে। উনি এসে ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমায় বললেন, 'ডি. পি.— এখানে কি মেয়েরাও থাকে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তবে আমরা ওদিকে কেউ যাই না।' উনি বললেন, 'আমি তো একবারও বলিনি, ওদিকে যেও না। তোমার মতো "বাফুন" আমি আগে দেখিনি।' আমি বললাম, 'আপনার আমাকে চিনতে এত সময় লাগার তো কথা নয়, আপনার সাথে ইংল্যান্ডে থেকেছি। আপনি আমাকে রেস্টুরেন্টে কাঁটা-চামচ কীভাবে ধরতে হয় শিখিয়েছেন, আমি যে "বাফুন" সেটা তো তখনই বোঝা উচিৎ ছিল।' আমার উত্তর শুনে উনি খুব হাসলেন। এই লোকটি আমাকে সব সময় নিরাপত্তা দিয়ে গিয়েছে।

আমার প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগেই গুলাম নবীর বদলে তারিক আনোয়ার সভাপতি হয়েছে। আমি আজও জানি, আমার নাম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, তারিক ইতিমধ্যে এ আই সি সি-র সম্পাদক হয়ে চলে গিয়েছে। এই ট্রানজিশনাল ফেজে নাগপুরে একটা যুব কংগ্রেসের বড় র‍্যালি হবে বলে ঠিক হল। ওখানেও প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিলাস মুত্তেম্বরের সাথে রঞ্জিত দেশমুখের। আমাকে পাঠানো হল একদিন আগে, যাতে গোষ্ঠী লড়াই রাজীবজির প্রোগ্রামের কোনও ক্ষতি করতে না পারে। আমি দায়িত্বের সাথেই বিষয়টি সামলালাম। রাজীবজি তখন দলের সাধারণ সম্পাদক। তাই কে. পি. সিং দেও প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন বলে ওনাকে যেতে হল, কারণ তা হলে ডিফেন্সের বিমানে যাওয়া যাবে।

রাজীবজি যখন নামলেন, ওনার সাথে সীতারাম কেশরীও এলেন। আমি প্রমাদ গুনলাম। এক, উনি আমাকে ঘোর অপছন্দ করেন। দুই, উনি তারিককে অতিশয় পছন্দ করেন। এবং নেমে প্রথম রাজীবজিকে নিয়ে পাউনারে বিনোবাজির আশ্রমে গেলেন। রাস্তায় যা বোঝাবার বোঝালেন। সফল সভা সেরে যখন রাতে ফিরব, প্লেনে অনেক জায়গা দেখে আমিও উঠে পড়লাম। কেশরী আমায় দেখে বললেন, 'তুমি আবার এখানে উঠলে কেন?' আমি বললাম, 'রাজীবজি বলেছেন।' উনি বললেন, 'যাই হোক, প্লেনে রাজীবজিকে বিরক্ত করতে এসো না। তুমি পেছনের কেবিনে গিয়ে বোসো।' আমি তাই মেনে নিলাম। দিল্লি পৌঁছে নামার সময় রাজীবজি বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ ডি. পি.। খুব ভাল সভা হয়েছে।' আমি বললাম, 'রাজীবজি, ইউ ব্রট ইয়োর ওন ক্রাউড অ্যান্ড অ্যাড্রেসড দেম। সো ক্রেডিট গোজ টু ইউ।'

ঠিক তারপরের দিনই আই ওয়াই সি-র সভাপতি পদে তারিকের নাম ঘোষিত হল। এ প্রসঙ্গের অবতারণা এই জন্য যে, তারপরের দিন অরুণ নেহেরু ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'ডি. পি., তুমি হয়ত শুনেছো, তোমার নাম সভাপতির জন্য বিবেচিত হচ্ছিল, কিন্তু আমিই মানা করেছি। বলেছি রাজ্যে ওর শত্রু বাড়িয়ে কাজ নেই, ও যেভাবে নীরবে কাজ করছে, তাই করতে দাও। কী ঠিক বলেছি তো?' আমি বললাম, 'আমি সত্যিই চালাতে পারতাম না। আপনি একদম ঠিক বলেছেন।' আমার ট্রেনিং-এর কাজ চালু রইল।

(ক্রমশ)

গুরুং দাপটে জ্বলন্ত পাহাড় ভুল রাজনীতির চলন্ত মাশুল

মিডিয়ার ভাষায় 'বাংলার পাহাড় আবার অগ্নিগর্ভ'। আর এবার আঁচটা যেন একটু বেশিই লাগছে। তার মানে গত তিরিশ বছর বাংলার হিমালয়ে আন্দোলনের নামে যে সব প্রদর্শনি চলেছে এবার বোধহয় তার থেকে একটু আলাদা অনুভূতি হচ্ছে। যেমন এবার গোর্খাল্যান্ড দাবির বৈধতাকে খোলাখুলি সমর্থন জানিয়েছে পৃথিবীর নানা কোণে থাকা নেপালি সমাজ। দ্বিতীয়ত পাহাড় যতই উষ্ণ হচ্ছে ততই সমতলের সঙ্গে দ্বেষ ও দূরত্ব বাড়ছে। যা বাম আমলের শেষ লগ্নে খানিকটা দেখা গিয়েছিল। এরই পুনরাবৃত্তি এবার যদি আর একটু বেশি মাত্রায় ঘটতে থাকে তবে হিংসা জাতি দাঙ্গার আকার নিতে পারে। স্বাভাবিক কারণেই প্রশাসনিক কর্তাদের তীব্র সজাগ থাকতে হচ্ছে। শান্তির বার্তা নিয়ে সমতলের মানুষ মিছিল করছেন ঠিকই, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায়, দোকানে বাজারে, সাধারণ মানুষের কথায় জাতি বিদ্বেষের নগ্ন প্রকাশ ঘটছে, যা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের মতোই ছড়িয়ে পড়তে পারে অতি দ্রুত। বলাই বাহুল্য সে হিংসায় ক্ষতিগ্রস্থ হবে একমাত্র নিরাপরাধ ছাপোষা মানুষ।

ইতিহাসের কচকচানিতে ফেসবুকের পাতা ভরছে, দার্জিলিং তুমি আসলে কার? নেপালিদের? লেপচাদের? নাকি বাঙালির? সুন্দরবনের বাঘের মতোই বাংলা ভাষাকে যাতে পরের প্রজন্মের মধ্যেই নিকেষ করে দেওয়া যায় সেই চেষ্টায় অহরহ ব্রতী বঙ্গপুঙ্গবেরা মিটিং মিছিল সভা এড়িয়ে চললেও ফেসবুকে হুংকার দিচ্ছে, বাংলা মাকে ভাগ হতে দিচ্ছি না দেব না। আজকাল আর ছেলেমেয়েদের 'ভাল' শিক্ষার জন্য পাহাড়ি কনভেন্টে পাঠাই না ঠিকই, কিন্তু তার চাইতে তিন গুণ বেশি টাকা দিয়ে চৈতন্যা- নারায়ণা-গৌতমা ইত্যাদির দেবদেবীর কিংবা কোনও সেন্টের নামাঙ্কিত নিকেতনে পাঠাই, যেখানে বাংলা মিডিয়ামের বংশটুকু না থাকে! সে যাকগে, বাংলা ভাষাভাষি পাঠকের নিশ্চয়ই অজানা নেই, এই গোর্খাল্যান্ডের দাবি আজকের নয়, একশ বছরের বেশি পুরনো। গত ১৬ জুনের ঘটনার পর বর্ষীয়ান মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি স্মৃতিচারণ করেছেন ১৯৮৩-র ঘটনার, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে। আর এক বর্ষীয়াণ কংগ্রেস নেতা দেবপ্রসাদ রায়ের কাছে শুনেছিলাম সেই সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের জমানায় অর্থাৎ ৭০-এর দশকে লেবং রেসকোর্সে ইন্দিরা গান্ধির জনসভা পণ্ড করে দেওয়ার প্রয়াসের কাহিনি। যার মূলে ছিল তৎকালীন অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগ, আর যাদের দাবি ছিল সেই স্বায়ত্ব শাসন। কেবল দার্জিলিং-কালিম্পং-ঝালং-জয়গাঁ কিংবা প্রতিবেশি নেপালেই নয় পৃথিবীর নানা প্রান্তে গিয়ে যেখানেই নেপালি ভাষী মানুষের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা হয়েছে বা মত বিনিময় হয়েছে, দেখেছি গোর্খাল্যান্ড নামক স্বপ্নরাজ্য সবাই কমবেশি বুকের মধ্যে লালন করে। সেই গোর্খাল্যান্ডের দাবি কতটা সাংবিধানিক,

> নিরিবিলি নিরুপদ্রব পাহাড়ি রাস্তায় নিরীহ মুখগুলি আবার হঠাৎ ক্ষেপে উঠল কেন? প্রায় নখদন্তহীন কোণঠাসা গুরুং এত সমর্থন, এত শক্তি যোগান পাচ্ছেন কী করে? যাঁরা পাহাড়ি ভাষা বা পাহাড়ি রাজনীতির বিন্দুবিসর্গ জানেন না, তাঁদের লালবাতি গাড়ি নিয়ে দাপটে পাহাড়ের পথে অহরহ আসা-যাওয়া ভাল মনে মেনে নেয়নি মানুষ।

কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে কিন্তু সেই সব মানুষ আদৌ ভাবিত নন। তেমনই গত সাড়ে তিন দশক ধরে যে আন্দোলন আমরা দেখে আসছি তা কতটা সমর্থনযোগ্য সে সব নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ তাঁরা। অর্থাৎ আম নেপালি ভাষাভাষি মানুষের আবেগের স্তরেই রয়ে গিয়েছে গোর্খাল্যান্ড, আর আজকের বুদ্ধিমান প্রজন্ম খুব ভাল করেই বোঝে যে চাইলেই সরকার কোনও জন আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে ভাববে তার কোনও মানে নেই।

গোর্খাল্যান্ড নিয়ে সাম্প্রতিক কোনও বিতর্ক সভায় যে প্রশ্নটি সবার আগে উঠে আসবে তা হল— বেশ তো হাসছিল বাংলার পাহাড়, হঠাৎ করে এত রেগে ওঠার কারণ কী? আর এই রাগ তো দেখে মনে হচ্ছে না শিগগিরি থামবে। বামেদের হাত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে দার্জিলিং হাতে পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার চেহারা যে মোটেই ভাল ছিল না তা বলাই বাহুল্য। তবু স্মৃতিকে খানিক উসকে দেওয়ার জন্য বলা যায়, তখন পাহাড়ের একচ্ছত্র ত্রাস বিমল গুরুংকে সামলানোর ক্ষমতা বাংলার সরকার হারিয়েই ফেলেছিল। সেই অবস্থা থেকে রাজনীতি ও প্রশাসনের সুচারু যুগলবন্দিতে পাহাড়ি গুন্ডাবাজিকে বন্দি করে ফেলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সাধারণ পাহাড়িরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, গুরুংয়ের থেকেও বড় দাদা কেউ আছেন যিনি পাহাড়িদের ভাল চান। অতএব তাঁকে নিজেদের লোক বলে বিশ্বাস করাই যায়! এরপর পাহাড়ি সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার নামে পৃথক পৃথক বোর্ড গঠন, পাহাড়ে ঘনঘন সফর তাঁর জনপ্রিয়তাকে কাঞ্চনজঙ্ঘার মতোই উচ্চতায় নিয়ে গেল, যার ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল গুরুং বাহিনীর শৌর্যবীর্য। আমরা দেখলাম পর্যটকের ঢল পাহাড় জুড়ে বছরভর, যা অতীতের যাবতীয় রেকর্ড ধুলিস্যাৎ করে দিল। যেখানে ম্রিয়মান হয়ে পড়ল সিকিমের ঝকঝকে প্যাকেজিং মোড়া ইকো পর্যটন (খুব স্বাভাবিক যুক্তিতেই বোঝা যায় চামলিঙের গোর্খাল্যান্ড সমর্থন)। অতঃপর দার্জিলিঙের আওতা থেকে কালিম্পঙের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুক্তি, বিজয়নী মমতা উদ্‌যাপন করতে চাইলেন বহু যুগ বাদে পাহাড়ে মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকে। আর তখনই ঘটল ছন্দপতন।

আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখলাম, রাতারাতি যেন পালটে গেল পাহাড়ের চেহারা। হাসিতে উচ্ছ্বল পাহাড়ের উজ্জ্বল আকাশে হঠাৎই শঙ্কার কালো মেঘ। নিরিবিলি নিরুপদ্রব পাহাড়ি রাস্তায় নিরীহ মুখগুলি আবার হঠাৎ ক্ষেপে উঠল কেন? প্রায় নখদন্তহীন কোণঠাসা গুরুং এত সমর্থন, এত শক্তি যোগান পাচ্ছেন কী করে? কলকাতায় বসে সেলিব্রিটি সাংবাদিকরা বা রাজনীতিক বোদ্ধারা এর কতটা যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দিতে পারবেন জানি না, কিন্তু কার্সিয়াং-কালিম্পঙের কোনও অখ্যাত গলিতে বসে এক সময়ের রাজনৈতিক মহলে বিচরণ করা বয়স্ক মানুষগুলি সহজ বাংলায় বুঝিয়ে দেবে এর উত্তর। তাঁদের মতে সেঞ্চুরি

> বাম সরকারের একের পর এক ভুল পদক্ষেপ বিমল গুরুঙের মতো চরিত্রকে সামান্য গাড়ির চালক থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি দিয়েছে এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। নির্বাচন না করে টানা তিন বছর ঘিসিংকে কেয়ারটেকার প্রশাসক হিসেবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, শিবচু-তে গুলি চালানো, মদন তামাং হত্যায় রেহাই ইত্যাদিই তৈরি করেছে আজকের বিমল গুরুংকে।

হাঁকানো দাপুটে ব্যাটসম্যান যেমন দীর্ঘক্ষণ ক্রিজে থাকার ফলে চরম আত্মবিশ্বাসী হয়েও ছোটখাট ভুল করে ফেলে এবং তার পরিণামে আউট হয়ে যেতে পারে, তেমনই অবস্থা হয়েছে বর্তমান শাসকের। যে প্রশাসনিক দক্ষতায় অভূত পূর্ব নিয়ন্ত্রণ এনেছিলেন পাহাড়ে, বলাই নিষ্প্রয়োজন, সাততাড়াতাড়ি নিজের সমতলের দলকে পাহাড়ে ঢুকিয়ে চালে সেই ছোট্ট ভুলটাই করে ফেলেছিলেন 'ম্যাডাম'। কেবল অনুপ্রবেশেই ক্ষান্ত থাকেননি, গুরুংকে খর্ব করার নামে যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখলের দৌড়ে নেমে পড়ল পাহাড়-অনভিজ্ঞ দল। যাঁরা পাহাড়ি ভাষা বা পাহাড়ি রাজনীতির বিন্দুবিসর্গ জানেন না, তাঁদের লালবাতি গাড়ি নিয়ে দাপটে পাহাড়ের পথে অহরহ আসা-যাওয়া ভাল মনে মেনে নেয়নি সাধারণ মানুষ। এবার তাঁদের মনে হতে শুরু করল, এরা আসলেই আমাদের লোক নয়। উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের খুশি করতে এসেছে। এবারের অশান্ত পাহাড়ে মিছিলে অবরোধে তাই আবার দেখা যাচ্ছে সেই সব নিরীহ মুখ, যে মুখ দেখা যেত ঘিসিং যুগের প্রথম দিকে। আর এদের সামনে পেয়ে গুরুঙের গুন্ডাগিরি আবার সেই আগের যায়গায় ফিরে গিয়েছে।

তৃণমূলের অনুপ্রবেশ, রাজনৈতিক চালে ঠিক না ভুল তা বিচার করবে সময়। কিন্তু পাহাড়ি শৃগালের মতো সুযোগের অপেক্ষায় যে গুরুংরা ওত পেতে ছিল তা তো দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। বাংলা ভাষা দার্জিলিঙের মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই বিকৃত খবর সুচারুভাবে পাহাড়ের কোণে কোণে দ্রুত পৌঁছে দিতে লাগল তারা। কারণ ভাষা বড় বালাই। মনে রাখতে হবে, এই ভাষার জোরেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, শিলচরে উনিশ জন শহীদ হয়। এই ভাষার স্বীকৃতিতেই কামতাপুর রাজ্যের দাবি দূর্বল হয়ে স্তিমিত হয়ে যায়। সেই ভাষার সুড়সুড়ি যে বারুদে আগুন লাগানোর পক্ষে যথেষ্ট, তাঁর নিজের অবস্থান থেকে যে মোক্ষম চাল দিয়েছেন গুরুং সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষ করে এখনও যখন গুরুঙের বিকল্প মুখ উঠে আসেনি, তখন সেই এক গোর্খাল্যান্ড ইস্যুতেই শাসককে নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া যায়, গত দু'সপ্তাহের ঘটনাবলী তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

আসলে সেই আমল থেকেই বাম সরকারের একের পর এক ভুল পদক্ষেপ বা ভুল সিদ্ধান্ত বিমল গুরুঙের মতো চরিত্রকে সামান্য গাড়ির চালক থেকে আজকের আন্তর্জাতিক খ্যাতি দিয়েছে এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। ২০০৫ সালে নির্বাচন না করে ছ'মাসের নামে টানা তিন বছর ঘিসিংকে কেয়ারটেকার প্রশাসক হিসেবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যেমন ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও দূরদর্শিতার অভাব, তেমনই ২০১১ সালে শিবচু-তে গুলি চালানোর সিদ্ধান্তও ছিল আরেকটি বড় রাজনৈতিক ভুল। এর আগেও আমরা অবাক হয়ে দেখেছি, ২০১০ সালে প্রকাশ্য দিবালোকে মদন তামাং হত্যার পর সিবিআই তদন্তে অভিযুক্ত হলেও, পাহাড়ের মানুষ মনেপ্রাণে চাইলেও বিমল গুরুংয়ের চুল স্পর্শ করল না পুলিশ, যার দায়িত্ব রাজ্য বা কেন্দ্র কেউই এড়িয়ে যেতে পারে না।

একই রকমভাবে সম্প্রতি মনে করিয়ে দিলেন এক নেপালি সাংবাদিক বন্ধু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলে হিল কাউন্সিল ও রাজ্য সরকারের কাজকর্মে নিয়ত সংঘাত এড়াতে দার্জিলিংকে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মর্যাদা দেওয়ার দরবার নিয়ে সর্বদলীয় প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন দিল্লিতে। কেন্দ্রে তখন নতুন ইউপিএ সরকার, দোসর বামেরা। স্বভাবতই সে দলে প্রতিনিধি পাঠায়নি তৎকালীন বিরোধি দল তৃণমূল কংগ্রেস। সে যাই হোক, দিল্লিতে দার্জিলিংকে ষষ্ঠ তপশিলের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয়

হিংসার তীব্রতা এবার পাহাড়ে অনেকটাই বেশি চোখে পড়ছে

সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে বেঁকে বসলেন তৎকালীন সংসদের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, যাঁর চেয়ারম্যান ছিলেন বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ। তাঁদের যুক্তি ছিল, এই ধরনের প্যান্ডোরা বাক্স একবার খুলে দিলে দেশ জুড়ে নানা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গড়ার দাবিতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে। বাংলায় বসে আমরা সে দিন তাজ্জব হয়ে ভেবেছিলাম, ঝাড়খন্ডের প্রশ্নে, উত্তরাখন্ডের প্রশ্নে, ছত্তিশগড়ের প্রশ্নে সংবিধান সংশোধন হতে পারে কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড হয়েও দার্জিলিং কোন অদৃশ্য কারণে গুরুত্ব পেল না তার উত্তর কে দেবে?

গোর্খাল্যান্ডের দাবি কোনও দিন মিটবে কি না বা বাইরের শক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উস্কানি আছে কি না, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে জ্যোতিষি বা গোয়েন্দা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে এটুকু বলা যায়, সরকারি তরফে এইসব একের পর এক ভুল না হলে আজকের এই অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। নানা প্রান্ত থেকে গোর্খাল্যান্ডকে সমর্থন জানালেও বিমল গুরুঙের হিংসা নীতির বিপক্ষে সবাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক বিচক্ষণতায় গুরুঙের গুন্ডাগিরি খর্ব হবেই এই বিশ্বাস রাখে অহিংস জনতা, কেবল তা সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু সহসা ধাক্কায় এটুকু পরিষ্কার, পাহাড়ের রাজনীতিতে সামান্য ফাঁকি বা কোনও হটকারী সিদ্ধান্তের বড় মাশুল আগামীতে দিতেই হবে। শান্তি ফেরাতে কোনও শর্টকাট জনমোহিনী নীতি নিতে গেলে অদূর ভবিষ্যতে আবার তৈরি হতে পারে নয়া প্রজন্মের বিমল গুরুং, যা পাহাড়ি মানুষের প্রকৃত কল্যাণের অন্তরায় হয়ে থাকবে। অতএব সেই পথ চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে। গোর্খাল্যান্ড থাকুক পাহাড়িদের হৃদয়ে সংগোপনে, আবেগে ও স্বপ্নে— সেটা মুছে ফেলার অধিকার বা ক্ষমতা নেই আমাদের কারুরই।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ছবি বাপি ঘোষ

বক্সা বাঘবন

সব আক্ষেপ মিটবে!

২০১৪ সালে দায়িত্ব পেয়েছিলেন বক্সা টাইগার রিজার্ভের। তিনটে বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, টাইগার রিজার্ভের নানা জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের জন্য। খানিকটা যেন অসময়েই অন্য দায়িত্ব নিয়ে বদলি হয়ে চলে যেতে হচ্ছে তাঁকে। এই অল্প সময়ে ডুয়ার্সের একমাত্র বাঘবনের ছবি কতটুকু বদলানো সম্ভব হয়েছে, তার কথাই শুনিয়েছেন বক্সা টাইগার রিজার্ভের বিদায়ী ফিল্ড ডিরেক্টর **উজ্জ্বল ঘোষ** আইএফএস।

বক্সার বাঘবন নিয়ে সাধারণ মানুষের ভ্রুকুঞ্চন দীর্ঘ দিনের। যেহেতু টাইগার রিজার্ভ তাই মানুষের মূল প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বা সন্দেহ, যা কিছু সব বাঘকে ঘিরেই। আজ আমাদের আর অস্বস্তি হয় না, কারণ 'বক্সার বাঘ সব গেল কোথায়'— এ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা-শ্লেষ ইত্যাদি যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তা অযৌক্তিক নয়। বরং 'বেটার লেট দ্যান নেভার', যদিও অনেকটা সময় লাগল, কিন্তু শেষ অবধি আমরা সাহস করে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলাম, না, সত্যিই বক্সার জঙ্গলে বাঘের দেখা পাওয়া কঠিন অর্থাৎ এটি একটি লো ডেনসিটি টাইগার রিজার্ভ।আর একই সঙ্গে এ-ও বলতে চাই, বক্সার এই বাঘ দেখতে না পাওয়ার কারণ খুঁজতে হলে যেতে হবে পিছনের দিকে, যেখানে জ্বলজ্বল করে ধরা পড়বে ভুলগুলি। বাঘ হল ইকো সিস্টেমের চূড়ায় বসে থাকা প্রাণী। বাঘ না থাকলে সহজেই অনুমেয়, সেই জঙ্গলের ইকো সিস্টেম দীর্ঘদিন ধরে বিঘ্নিত। আর সেইসব তথ্য জানতে হবে আপনাদেরও।

১৮৭৪-৭৫ সালে রায়মাটাং, পানা, রাজাভাতখাওয়া এবং পানবাড়ি— এই চারটি ব্লক নিয়ে প্রথম তৈরি হল জলপাইগুড়ি ফরেস্ট ডিভিশন। এর আয়তন ছিল ১১০ বর্গমাইল। এর পর জলপাইগুড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ১৮৭৭-৭৮ সালে তৈরি হয় বক্সা ডিভিশন। এর ঠিক এক বছর পর, ১৮৭৯ সালের ২৩ জানুয়ারি সরকারিভাবে ভল্কা, বক্সা, রায়ডাক ও ধুমপাড়া— এই চারটে ব্লক যোগ করে বক্সাকে রিজার্ভ ফরেস্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৯১ একর। তখন মূলত এটি বাঘ শিকারের জন্যই পরিচিত ছিল। ১৮৭৪-৭৫ থেকে ১৯২৮-২৯ পর্যন্ত বক্সার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনটি ওয়ার্কিং প্ল্যান তৈরি হয়। এই প্ল্যান তৈরি করেন জনৈক সেভিয়ার সাহেব। আমরা আজকে যে বক্সা দেখতে পাচ্ছি, তার আসল রূপকার তিনিই। আবার ঘুরিয়ে বললে, আজকের বক্সা বাঘবনের পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে সেই সেভিয়ার সাহেবের কল্যাণেই। এই কর্মসূচিতে শুধুমাত্র গাছ লাগানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সাধারণত জঙ্গল দু'ভাবে তৈরি করা যায়। এক, স্বাভাবিক উপায়ে বীজ পড়ে নতুন গাছের জন্ম হওয়া। দ্বিতীয়ত, বীজ সংগ্রহ করে তা থেকে চারা তৈরি করে সেই চারাগাছ রোপণ করা। এটাই হল কৃত্রিম উপায়ে বনসৃজন। দ্বিতীয়ত, সে সময় এদিকটায় শ্রমিকের ছিল বড়ই অভাব। সে কারণে বাইরে থেকে লোকজন এনে তাদের বনের সীমান্তে বসানো হয়েছিল। তাদের দিয়ে চারাগাছ লাগানো হত। জঙ্গলের বিভিন্ন কাজ করানো হত। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় টোঙ্গিয়া সিস্টেম। এভাবেই শুরু হল বনবস্তি। এরা জঙ্গলে গাছ লাগাত আর নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছু জায়গায় চাষাবাদ করত। সেভিয়ার সাহেবের উদ্যোগেই এই বনবস্তির সূত্রপাত। চতুর্থ কর্মসূচিতে মিস্টার হামফ্রি জঙ্গলের প্রাণীকুলের সুবিধার জন্য সাভানা ঘাস লাগানোর কথা বলেন। কারণ ঘাস পুরনো হয়ে গেলে তার পাতা শক্ত হয়ে যায়। তৃণভোজী প্রাণীদের খুব সমস্যা হয় তখন। পঞ্চম কর্মসূচিতে উদ্যোগ নেওয়া হয় 'কন্ট্রোলড বার্নিং অব সাভানা'র। এখনও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পুরনো ঘাস পুড়িয়ে সেখানে নতুন করে ঘাস লাগানো হয়। কচি নরম ঘাসে ভরে ওঠে জঙ্গল। এ সময়ই জলদাপাড়াকে প্রথম 'গেম স্যাঙ্কচুয়ারি' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৫-৮৫ সালে সপ্তম ও অষ্টম কর্মসূচিতে ওই অঞ্চলের একটা বিরাট অংশে সেগুন

গাছ লাগানো হয়। জোর দেওয়া হয় কাঠ উৎপাদনে। তখন পর্যন্ত কিন্তু বন্য প্রাণ গুরুত্ব পায়নি। গুরুত্ব পেল অনেক পরে। অতএব বোঝাই যাচ্ছে, আমাদের বক্সার ম্যানেজমেন্ট কোনও সময়ই বন্য প্রাণকেন্দ্রিক ছিল না।

পঁয়ত্রিশ বছর হতে চলল, ১৯৮৩ সালে বক্সা প্রথম টাইগার রিজার্ভ হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। আর তখনই বক্সার জঙ্গল নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভাবনাচিন্তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। ততদিনে অবশ্য বনবস্তিসহ সংলগ্ন চা-বাগানেও হু হু করে বেড়েছে জনসংখ্যা। এই সময় থেকেই বক্সা টাইগার রিজার্ভে শুধুমাত্র বন্য প্রাণ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তার ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া হল। এই ব্যবস্থাপনায় কোর এরিয়ায় ফেলিং বন্ধ করা হল, হ্যাবিট্যাট ইমপ্রুভমেন্টের উপর জোর দেওয়া হল, বনসুরক্ষাব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হল। আর এখানে কোথায় কোথায় কীভাবে ইকো টুরিজম করা যায় তা নিয়েও চিন্তাভাবনা শুরু হল। ২০১৪ থেকে ২০২৪ ওয়ার্কিং প্ল্যানে শুরু হল আমাদের টাইগার কনজার্ভেশন কর্মসূচি।

২০০০ সালের আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বনে প্রাণীকুলকে সুস্থভাবে রাখতে হলে জঙ্গলের স্বাভাবিক উদ্ভিদের উপর জোর দিতে হবে। তাই সেগুনের মতো গাছ লাগানো বন্ধ করে প্রাণীদের খাদ্যের উপযুক্ত উদ্ভিদ, বিশেষ করে ঘাস লাগানোর কথা চিন্তা করা হল। সেগুন গাছ লাগানো তো বন্ধ হল। কিন্তু সমস্যার তাতে সমাধান হল না। কোর এরিয়ার মধ্যে বিরাট বিরাট যেসব সেগুন গাছ রয়েছে, তারা ডালপালা দিয়ে উপরের অংশ পুরো ঢেকে ফেলেছে। এর ফলে তার তলায় মাটিতে স্বাভাবিক উদ্ভিদ জন্ম নিতে পারে না। এদিকে এটা একাধারে ন্যাশনাল পার্ক, সংরক্ষিত এলাকা, স্যাংচুয়ারি, টাইগার রিজার্ভ। হয়ত কিছু দিনের মধ্যেই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভও হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে হঠাৎ করে গাছ কেটে ফেলা যায় না। তাই ২০০৬-০৭ সাল থেকে শুরু হল সম্পূর্ণ গাছ না কেটে গাছের উপরের সেই আচ্ছাদনকে কেটে ফেলা। একে আমাদের ভাষায় বলা হয় ক্যানোপি ওপেনিং। এ ছাড়াও জঙ্গলের ভিতরে ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছ বা শুকনো গাছগুলোকে সরিয়ে দিয়ে সেইসব জায়গায় ধীরে ধীরে উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া শুরু হল, সেটা ২০১০-১১ সালের কথা। এখন আমাদের কাছে প্রায় ২ বর্গকিলোমিটার তৈরি করা গ্রাস ল্যান্ড রয়েছে। ২০১০-এর পর থেকে ১০০ থেকে ১৫০ হেক্টর স্বাভাবিক উদ্ভিদের বনভূমি তৈরি করা হচ্ছে প্রতি বছর। বিশেষ করে নিমাতি, জয়ন্তির কিছু অংশ, রাজাভাতখাওয়া, রায়ডাকে আমার সাফল্যও পেয়েছি। দেখা যাচ্ছে, গত ৫-৬ বছরে আমরা এর পিছনে যে পরিশ্রম করেছি, আজ তার ফল পাওয়া যাচ্ছে। তথ্য বলছে, প্রতি বছর জঙ্গল থেকে হাতি, গাউর— এদের জঙ্গল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা বক্সায় অনেকটা কম হয়েছে। জঙ্গলে পর্যাপ্ত খাবার থাকলে এদের বাইরে বার হবার অন্য কোনও কারণ থাকে না।

সেই সঙ্গে জঙ্গলে অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সাধারণত শীতের শেষে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চের দিকের সময়টায় বনে আগুন লাগে। এই আগুনের নিচের দিকের ঘাসগুলো পুড়ে যায়। তখন বন্য জন্তুরা হয় জঙ্গলের আরও ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে, নয়ত বাইরে বেরিয়ে আসে। গত ৩-৪ বছর বক্সায় আগুন লাগার ঘটনা অনেক কম। আগুন লাগলে পরে তা যাতে সঙ্গে সঙ্গে জানা যায়, তার জন্য ফায়ার ওয়াচার রাখা হয়েছে, ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম বসানো হয়েছে। তেমনই আগুন নেবানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে ফায়ারলাইন। সেই ফায়ারলাইনকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এর ফলে আগুন লাগা অনেকাংশ কমে এসেছে। এ ছাড়াও জঙ্গলে প্রচুর জলাশয় তৈরি করার কাজে হাত দিয়েছি। ফলে বক্সা থেকে বড় জন্তুর বাইরে বেরিয়ে আসা এবং মানুষের সঙ্গে সংঘাত বর্তমানে অনেক কম। যদিও জঙ্গল থেকে লেপার্ডের বাইরে বেরিয়ে আসার ব্যাপারটা একটু আলাদা। জঙ্গলে খাবারের অভাবের জন্য যে তারা বাইরে বেরিয়ে আসছে তা নয়। এরা বড় নালার মতো জায়গায় লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। আশপাশে চা-বাগানের কুলিলাইন বা বনবস্তির হাঁস-মুরগি, ছোট ছাগল খুব সহজেই পাওয়া যায়, আর এসব এরা খেতেও বেশ পছন্দ করে। লেপার্ড কখনওই ঘন জঙ্গলের বাসিন্দা নয়। থাকলেও এরা খাবার জন্য বাইরে বার হবেই। এটা এদের অভ্যাস। বলাই বাহুল্য, বর্তমানে আমাদের এখানে লেপার্ডের সংখ্যাও বেড়েছে।

বাঘের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার পিছনে আরও কয়েকটি বড় কারণ রয়েছে বলে আমার মনে হয়। বক্সার বেশ কিছু জায়গায় বড় বড় গাছের জঙ্গলকে তৃণভূমিতে পরিণত করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। বক্সাকে বাঘের উপযুক্ত করার জন্য আমাদের পুরো উলটো পথে হাঁটতে হচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক হতে আরও ১০-১৫ বছর সময় লাগবে। আমাদের জঙ্গলের প্রয়োজনে, শ্রমিকের প্রয়োজনে একসময় বনবস্তি তৈরি করতে হয়েছিল। সেখানে প্রত্যেক পরিবারকে সাড়ে সাত বিঘা করে জমি দিয়ে বাইরে থেকে মানুষ এনে বসানো হয়েছিল। ফলস্বরূপ এখন বক্সায় ৩৮টি বনবস্তি রয়েছে। প্রথম যখন বনবস্তির সূচনা হয়েছিল, তখন মানুষের সংখ্যা ছিল এক থেকে দেড় হাজার। সেখানে বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৫০,০০০। এতদিনে কথা হচ্ছে এই বনবস্তির লোকজনকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার। কারণ বাঘের থাকার জন্য সম্পূর্ণ উপদ্রবহীন এলাকার প্রয়োজন। বনবস্তি ছাড়াও এখানে জঙ্গলের বাইরে ৪৯টা স্বীকৃত গ্রাম রয়েছে। আর রয়েছে ৩৭টি চা-বাগান। রয়েছে অজস্র নদীনালা, ঝোরা ইত্যাদি। জঙ্গলের চারপাশে মানুষের সংখ্যাই এখন হয়েছে ৩ লক্ষের বেশি। শুধু তো মানুষ নয়, এদের সঙ্গে আছে

বক্সার বেশ কিছু জায়গায় বড় বড় গাছের জঙ্গলকে তৃণভূমিতে পরিণত করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। বক্সাকে বাঘের উপযুক্ত করার জন্য আমাদের পুরো উলটো পথে হাঁটতে হচ্ছে। সব কিছু ঠিকঠাক হতে আরও ১০-১৫ বছর সময় লাগবে।

তাদের পালিত গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি। তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়, ১ লক্ষের উপরে। খাদ্যের যে অংশটুকু হওয়া উচিত ছিল সম্পূর্ণভাবে বন্য প্রাণের, তাতে ভাগ বসাল এইসব মানুষসহ তাদের পালিত জীবজন্তুরাও। এই কারণে বনবস্তি অন্যত্র সরিয়ে না নিলে বিপদ। ইতিমধ্যেই এদের জন্য 'রিলোকেশন প্যাকেজ' ঘোষণা করেছে সরকার। তবে জোর করে নয়, বুঝিয়েই এবং সহমতের ভিত্তিতেই এদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটাও যেন একরকম উলটো পথে হাঁটা। একসময় নদীর জলে ডলোমাইট মেশা ছিল আরও একটি বড় সমস্যা। জয়ন্তিতে বেঙ্গল লাইম, নর্থ বেঙ্গল ডলোমাইট এদের দূষণ সহ্য করতে না পেরে জীবজন্তুরা সেখান থেকে সরে গেল। কিছু নিচে নেমে এল, কিছু ভুটানের দিকে চলে গেল। ১৯৮০-তে ফরেস্ট কনজার্ভেশন অ্যাক্ট তৈরি হল। তারপর থেকে নানাভাবে নোটিশ দিয়ে, অনেক ঝুটঝামেলা করে অবশেষে ১৯৯৫ সালে বন্ধ হয়। এখন ফাঁসখাওয়ার দিকে গেলে তা-ও কিছুটা সবুজ দেখা যায়।

তবে সব চেয়ে বড় সমস্যা ছিল শিকার, বা বলা উচিত শিকার উৎসব। তথ্য বলছে, ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ১৫০টি বাঘ মারা হয়েছে। সে সময় রাজা এবং ব্রিটিশদের কাছে শিকার করাটা গর্বের ব্যাপার ছিল। ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত মারা হয়েছে ৩৬টি বাঘ। ১৯৫৫-১৯৭৪ সালে লেপার্ড মারা হয়েছে ৪২টি। স্লথ বিয়ার মারা হয়েছে ৩৬টা। একে এখন আর প্রায় দেখাই যায় না। একই সময়

৫৫৯টা বন্য শুয়োর মারা হয়। এই গেম স্যাংচুয়ারি বাঘদের হারিয়ে যাওয়ার যাওয়ার একটা বড় কারণ। একটা সময় এমন হল যে, তাদের প্রজনন এবং বংশবৃদ্ধি কোনওটাই সম্ভব হল না। ১৯৮০ সালের পর যে ক'টা হাতে গোনা বাঘ ছিল, তারাও পরিবেশের কারণে অন্য জঙ্গলে চলে গেল। কিছু গেল ভুটানের জঙ্গলে, কিছু গেল আসামে। বক্সার পূর্ব প্রান্তে সংকোশ নদী। তার ওপারে আসামের মানস ন্যাশনাল পার্কের বাফার রিজিয়ন। মাঝে কচু গাঁও, গোসাই গাঁও, হল্টু গাঁওয়ের জঙ্গল দিয়ে একটা করিডর ছিল। সেখানে দিয়েই হাতি, বাঘ যাতায়াত করত। কিন্তু একসময় আসামে জঙ্গি কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ায় এখানের পরিবেশ অন্যরকম হয়ে যায়। করিডরটাও নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৮৩ সালের পর সরকারিভাবে কোনও শিকারের খবর পাওয়া যায় না। তবে চোরাশিকার বন্ধ হয় না। লেপার্ড, হাতি, গাউর, হরিণ পোচিং-এর খবর পাওয়া গেলেও বাঘের পোচিং-এর কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তখনই ধারণা করা হয় যে, এরা সব মাইগ্রেট করেছে। ন্যাশনাল টাইগার কনজার্ভেশন অথরিটির পরিসংখ্যানগত তথ্য অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে ৩টে বাঘ রয়েছে। তাই এরা শুধু বিটিআর-এ রয়েছে কি না বলা শক্ত।

এই অবস্থায় বক্সায় বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য ১০ বছরের একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একে বলা হচ্ছে 'টাইগার অগমেন্টেশন প্ল্যান'। এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, বাঘেদের বিচরণক্ষেত্রকে তাদের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। ঘাসের জঙ্গল তৈরি করতে হবে। জলাশয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। যেসব আগাছা এই জঙ্গলে থাকা ঠিক নয়, এখানে বসবাসকারী জন্তুদের পক্ষে ঠিক নয়, সেসব নির্মূল করতে হবে। জঙ্গলকে নিরাপদ করতে হবে। এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যেটা তা হল, বনবস্তির লোকজনকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে। এখানের ভুটিয়া বস্তির লোকদের সঙ্গে কথাও হয়েছে। দুটো গ্রাম আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে। তারা রাজি। তাদের আমরা মডেল ভিলেজ করে ঘরবাড়ি, রাস্তা, বিদ্যুৎ সব ব্যবস্থা করে দেব। এ ক্ষেত্রে সরকারের দুটো প্যাকেজ রয়েছে। এক, দশ লাখ টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। দুই, আমরা প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে দেব, চাষের জন্য জমিও দেব। তবে জোর করে নয়, সবটাই বুঝিয়ে এবং সহমতের ভিত্তিতেই করতে হবে। তবে এই রিলোকেশন ব্যাপারটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। এর জন্য মানুষকে, বিভিন্ন সংস্থা, এনজিও-কে এগিয়ে আসতে হবে। একেকটা গ্রাম ধরে ধরে তাদের বুঝিয়ে এই কাজটা করাতে হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামে তো এসব এনজিও-রাই করেছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বদেরও একটু দায়িত্ব নিতে হবে। জঙ্গলের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য নজরদারি বা পেট্রোলিং বাড়াতে হবে। সুরক্ষার জন্য বনবস্তির লোকেদের সহযোগিতা নিতে হবে। এ ছাড়াও বানানো হবে অ্যান্টি পোচিং চৌকি। একই সঙ্গে চলবে অন্য জঙ্গল থেকে বাঘদের এই জঙ্গলে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া।

বক্সার জঙ্গলে বাঘসহ কী ধরনের বন্য প্রাণ আছে তা সঠিক করে বলা যাচ্ছিল না। এ ব্যাপারে দিল্লি ন্যাশনাল কনজার্ভেশন অথরিটি বলেছে, বারবার সেন্সাস করার দরকার নেই, এখন থেকে ট্র্যাপ ক্যামেরা দিয়ে বন্য প্রাণের খবর জানতে হবে। আমরা গত তিন বছর ধরে বিটিআর-এ ৭০ জোড়া অর্থাৎ ১৪০টা ক্যামেরা রেখেও একটাও বাঘের ছবি পাইনি। তবে পরোক্ষ প্রমাণ হিসাবে বিষ্ঠার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছিল ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউটে। তারা আবার বলেছে, বাঘ আছে। যদিও প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ নেই। তবে বাঘ থাকুক বা না-ই থাকুক, এখানকার জঙ্গল এখন বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিরাপদও হয়েছে। যার ফলে এতদিনে আমরা ভাবতে পারছি এখানের জঙ্গলে বাঘ ছাড়ার কথা।

এখানে একটা মজার কথা বলে রাখি, ট্র্যাপ ক্যামেরা আসার পর আমরা জানতে পারলাম, এই জঙ্গলে কত ধরনের জীবজন্তু রয়েছে। তার আগে পর্যন্ত এখানে কী কী জন্তু রয়েছে তা আমরা বুঝতেই পারতাম না। কখনও দেখা যেত না। কোনও

ডকুমেন্টেশনও করা যেত না। এখন বন্য কুকুর, সেরো, হিমালয়ান গোরাল, লেপার্ড, লেপার্ড ক্যাট, সিভেট ক্যাট, মার্বলড ক্যাট, জাঙ্গল ক্যাট, গোল্ডেন জ্যাকাল, শম্বর— এদের সবাইকে এখন ট্র্যাপ ক্যামেরার দৌলতে দেখা যাচ্ছে। জলদাপাড়া ও গোরুমারায় শম্বর বেড়ে গিয়েছে। সেখান থেকে শম্বর এনে এখানে ছাড়া হবে। এখনও কিছু চিতল এখানে থাকলেও বক্সার এই পরিবেশ চিতলের পক্ষে খুব একটা উপযুক্ত নয়। তবে হাজার পার স্কোয়্যার কিলোমিটার জনঘনত্ব নিয়েও যে আমরা জঙ্গলটা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি, সেটাই আমাদের বিরাট অ্যাচিভমেন্ট। ট্র্যাপ ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে, মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা বাড়ছে, তার মানে আমরা সঠিক দিশাতেই রয়েছি। আমাদের জঙ্গল এখন সুস্থ আছে। টিক প্ল্যান্টেশন থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে আমরা যে কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নিইনি, মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি তা প্রমাণ করেছে। তবে এখানে হাতির সংখ্যাও বেড়েছে, গত সেন্সাসেই ১৫০-এর বেশি হাতির কথা বলা হয়েছে।

এই বছরটা বিটিআর বা উত্তরবঙ্গের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ বছর। অবশেষে এখানে বাঘ আসছে। বক্সার জঙ্গলে বাইরে থেকে বাঘ নিয়ে এসে তাদের কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়, কীভাবে বক্সা টাইগার রিজার্ভের মর্যাদা বাড়ানো যায়, এখন এসব দিকে জোর দিতে হবে। ফি-বছর বক্সাতে যে পরিমাণ পর্যটক আসছে, এখানে বাঘ থাকলে পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৫০ থেকে ৬০ গুণ বেড়ে যাবে। সেই অর্থনৈতিক উন্নতি তো জঙ্গলের পাশে থাকা মানুষদেরই হবে, সেটাও তাদের বোঝাতে হবে। ভারতের করবেট,

বান্ধবগড়— এসব জায়গায় উন্নতি হয়েছে বাঘকে কেন্দ্র করেই। বক্সার জঙ্গলে আসামের কাজিরাঙা বা ওরাং থেকে বাঘ আসবে। সুন্দরবনের বাঘ এখানে এনে ছাড়া যাবে না, কারণ ওর জিনগত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। বাঘকে একই রকম

এই বছরটা বিটিআর বা উত্তরবঙ্গের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ বছর। অবশেষে এখানে বাঘ আসছে। বক্সার জঙ্গলে বাইরে থেকে বাঘ নিয়ে এসে তাদের কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়, কীভাবে বক্সা টাইগার রিজার্ভের মর্যাদা বাড়ানো যায়, এখন এসব দিকে জোর দিতে হবে। ফি বছর বক্সাতে যে পরিমাণ পর্যটক আসছে,এখানে বাঘ থাকলে পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৫০ থেকে ৬০ গুণ বেড়ে যাবে।

জলবায়ু, একই রকম পরিবেশ থেকে আনতে হবে, যাতে জিনগত বৈশিষ্ট্য এক থাকে। না হলে নতুন জায়গায় সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে না। আসামের রাজ্য সরকার অনুমতি দিয়েছে। সেখানে বাঘ উদ্বৃত্ত। প্রথম পর্যায়ে দুটো বাঘ, চারটে বাঘিনি আসবে। পরের তিন বছরে আবার দুটো বাঘ, চারটে বাঘিনি আনা হবে। মোট ১২টা বাঘ আনা হবে বক্সায়। এখানে ৭৬০ বর্গকিলোমিটার জায়গা রয়েছে। সেখানে পরবর্তীতে ২০-২২টা বাঘকে আমরা সুন্দরভাবে রাখতে পারব। বাঘ যদি নিরাপত্তা পায় তাহলে সে বংশবৃদ্ধি করবেই। তবে শুধু বাঘ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলে চলবে না। ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউটের লোকেদের দু'বছর ধরে ৩৬৫ দিন, ২৪ ঘণ্টা এদের ওপর নজরদারি চালাতে হবে। প্রতিটা বাঘের গলায় পরানো থাকবে রেডিয়ো কলার। আমাদের উত্তর দিকের ৬৫ কিলোমিটার সীমানা রয়েছে ভুটানের সঙ্গে। বাঘ যদি কোনওভাবে ভুটানের জঙ্গলে চলে যায়, তাকে ট্র্যাক করা যাবে। সে ক্ষেত্রে ভুটানকে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

চোরাশিকারের ভয় যে একেবারে শূন্য হয়েছে তা বলা যাবে না। তবে হাতির পোচিং অনেক কমে গিয়েছে। ২০১৪-তে

আসাম থেকে একটা গ্রুপ এসেছিল, তারা চারটে পোচিং করেছে। পরবর্তীতে আর কিছু দেখা যায়নি। তবে আমাদের এখানকার কোনও গ্রুপ কিন্তু এ ব্যাপারে সক্রিয় নয়। মাঝেমধ্যে চা-বাগান বা গ্রাম থেকে দু-একটা বনশুয়োর মারে, তা-ও সেটা তেমন কিছু নয়। বেশ কিছুদিন আগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একটি হাতি মারা গিয়েছে, কিন্তু সেটা পোচিং নয়। চোরাকারবারের যে বড় চক্রটা চলছে তা সম্পূর্ণ মণিপুর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আগে টাকার জন্য হাতির দাঁত বা গন্ডারের শিং কেটে নেওয়া হত। চলে যেত চিনে। এখন টাকার পরিবর্তে আসছে অস্ত্র। এসবের সঙ্গে জঙ্গিদের যোগসূত্র হয়ে গিয়েছে। মণিপুর, বর্মা, নাগাল্যান্ডের দিক থেকে যেসব গ্যাং কাজ করছে, তারাই আসাম এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গে লোক পাঠিয়ে এসব করাচ্ছে। সেখানে টেলিস্কোপিক রাইফেল, একে ৪৭-এর মতো বন্দুক ব্যবহার করা হচ্ছে। বড় জন্তুর পোচিং বন্ধ থাকলেও তক্ষক মাঝেমধ্যেই ধরা পড়ছে। এদের মোকাবিলাই এখন আমাদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। বন দপ্তরের একার পক্ষে এটা সামলানো সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই আমরা বিএসএফ ও এসএসবি-র সঙ্গে বসেছি।

বর্তমানে টুরিজমের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ইকো টুরিজম নিয়ে নানা পলিসিও হচ্ছে। টুরিজম যদি পদ্ধতিগতভাবে ঠিক থাকে তাহলে বন্য প্রাণের সঙ্গে তার কখনওই সংঘাত হবে না। নিয়ম হচ্ছে, কোর এরিয়ার সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ব্যবহার করা যেতে পারে টুরিজমের জন্য। আর বাফারে তো টুরিজম করাই যাবে। তবে কোর বাফার যেখানেই হোক, টুরিজম করতে হবে টাইগার কনজারভেশন প্ল্যান-এর গাইড লাইন মেনেই। কোর এরিয়ায় টুরিস্ট লজ বা টুরিস্টদের আনাগোনায় সমস্যা হয় বন্য প্রাণের। বলা আছে, জঙ্গলের মধ্যে কোনও রাস্তা মেটালের করা যাবে না। বক্সা দুয়ার অবধি রাস্তা তৈরি হলেও সেখানে গাড়ি চলাচল করা আমরা সমর্থন করি না। কারণ ওটা কোর এরিয়ার মধ্যে পড়ে। এসব কিছু আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। কোনও বিভাগের একক সিদ্ধান্তে কিছু করা সম্ভব নয়। বক্সায় যদি বাঘ নিয়ে আসা হয়, তবে অবশ্যই টুরিজম বাড়বে। সে সময় সঠিক পরিকল্পনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। টুরিস্টকে বনের আইন মেনে চলতেই হবে। নইলে সমস্যা অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ করে আমাদের মতো জায়গায়, যেখানে সচেতনতা কম, মানুষের শিক্ষা কম।

আমাদের কোর এরিয়া থেকে চাপ কমানোর জন্য রায়ডাকে একটা টুরিজম প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। তার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তা পাশও হয়েছে। এখন গ্রাভেল রোড তৈরির কাজ চলছে। সেখানে ওয়াচটাওয়ার তৈরি করা হয়েছে। ওখানে কতকগুলো বনবস্তি, রাভা বস্তি আছে। তাদের যদি এই টুরিজমের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক উন্নতি হবে। আশা করছি, এই ধরনের প্ল্যান পর্যটকদের কাছে খুব আকর্ষণীয় হবে।

রাজাভাতখাওয়ার ২.৫০ হেক্টর জমিতে আমরা চেষ্টা করছি একটা বিশ্বমানের প্রজাপতি সংরক্ষণ উদ্যান তৈরি করতে। এইদিকে যত প্রজাতির প্রজাপতি দেখা যায় তা সত্যি অবাক করার মতো। এই উদ্যানে খাঁচার মতো কিছু রাখা হবে না। এর জন্য প্রজাপতির নিজস্ব কিছু নির্দিষ্ট গাছ আছে। সেখানে তারা ডিম পাড়ে। তার পাতাগুলোকে খায়। সে ধরনের গাছ লাগাতে হবে। এ ছাড়াও কিছু গাছ আছে, যার ফুলে পূর্ণবয়স্ক প্রজাপতি এসে বসে। সেসব গাছ লাগাতে হবে। প্রজাপতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে। পর্যটনের মানচিত্রে একে আনতে হবে। এসব যদি ঠিকঠাক এগয়, তবে বক্সা টাইগার রিজার্ভ অচিরেই ফিরে পাবে তার হারিয়ে যাওয়া গ্ল্যামার। উত্তরবঙ্গের সেরা জঙ্গল নিয়ে অজস্র বনজঙ্গলপ্রেমী, প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের যে দীর্ঘ দিনের নানা আক্ষেপ রয়েছে তা দূর হয়ে যাওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার।

ছবি উজ্জ্বল ঘোষ, আইএফএস

জার্নি ডেট: ০৬/১০ ও ২৭/১২/২০১৭
(১৫ দিনের টুর, এনজেপি থেকে এনজেপি)

২১,৬০০ টাকা জনপ্রতি (প্রাপ্তবয়স্ক)
১৮,৮০০ টাকা জনপ্রতি (তৃতীয় ব্যক্তি)
১৬,৮০০ টাকা (৫-১১ বছর বয়সী)
৯,৬০০ টাকা (২-৪ বছর বয়সী)

টুর প্যাকেজে থাকছে
১) আপ ও ডাউন স্লিপার ক্লাসের ভাড়া
২) ডিলাক্স বাস বা টেম্পো ট্রাভেলার
৩) ফ্যামিলি প্রতি রুম
৪) সব খাবার (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ইভনিং টি, ডিনার) **(ট্রেনের খাবার বাদে)**

বেড়াতে চলুন ছোট্ট ছুটিতে

২ রাত ৩ দিনের প্যাকেজ টুর
(শিলিগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি)

ওল্ড সিল্ক রুট	: ৪৫০০ টাকা
পেলিং	: ৫৫০০ টাকা
লোলেগাঁও রিশপ	: ৪৫০০ টাকা
গ্যাংটক সঙ্গে ছাঙ্গু	: ৫৫০০ টাকা
ডুয়ার্স	: ৪১০০ টাকা
দার্জিলিং	: ৪৯০০ টাকা

(খরচ জনপ্রতি)

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
খাওয়া, থাকা, সাইট সিইং

দ্রষ্টব্য: প্রতি প্যাকেজে অন্তত ৮ জন হতে হবে

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office:
Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101
Ph: 03561-222117, 9434442866

‘শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব’ শুরু শিলিগুড়িতেও

শিলিগুড়িতে গীতালি চক্রবর্তীর আহ্বানে হাজির হয়েছিলেন জনা কুড়ি শ্রীমতী। দারুণ উৎসাহে জলপাইগুড়ি থেকেও পৌঁছে গিয়েছেন জনা বারো। সে এক হইহই ব্যাপার। এসেছিলেন মালবাজার ক্লাবের আহ্বায়ক মীনাক্ষী

ঘোষও। নিজেদের জন্য একটা মুক্ত আকাশ চাই। চাই একটুখানি টাটকা বাতাস। মনের আনন্দে বেঁচে থাকার জন্য পাশে চাই বন্ধু। এটুকুই। সমমনস্ক কয়েকজন মিলেমিশে পাশাপাশি থাকলে আর কী দরকার?

জুলাই মাসে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি কোচবিহারেও। ওখান থেকে ডাক আসছে খুব। অনেকেই চাইছে, ‘আমাদের এখানেও শাখা খোলা হোক।’ তাই এবার কোচবিহারের অপেক্ষায়।

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch

(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

‘ডুয়ার্সের ডিশ’। এবার থেকে ডুয়ার্সের রাঁধুনিরা হাজির করছেন রন্ধনশৈলীর নানা এক্সপেরিমেন্ট। এবারের রাঁধুনি **ঝর্ণা ভট্টাচার্য**, হাজির করেছেন তাঁর জোড়া রেসিপি।। আপনিও আপনার উদ্ভাবনী রন্ধনশৈলীর পরিচয় দিতে পারেন আকর্ষণীয় কোনও রেসিপি পাঠিয়ে। মেল করুন ‘এখন ডুয়ার্স’-এর ই-মেল আইডি-তে।

মোচার সরষে-পোস্ত

উপকরণ: মোচা ১টা, সরষে ৩ চামচ, পোস্ত ৩ চামচ, সরষের তেল ২০০ গ্রাম, বেসন ২ চামচ, চালের গুঁড়ো ২ চামচ, কাঁচালংকা চারটে, নুন, মিষ্টি, হলুদ স্বাদমতো, কালো জিরে অল্প।

প্রণালী: মোচার শক্ত ডাঁটি ফেলে ছড়া সমেত ছাড়িয়ে রাখতে হবে। এর পর বেসন ও চালের গুঁড়োর ব্যাটার করে তাতে মোচার ছড়াগুলো ডুবিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে তুলতে হবে। ছড়াগুলো ভাজা হয়ে গেলে কড়াতে তেল দিয়ে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে অল্প হলুদ, স্বাদমতো নুন, মিষ্টি, কাঁচালংকা ও জল দিন। ফুটে উঠলে সরষে-পোস্ত বাটা দিয়ে নামিয়ে নিন। গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। দারুণ খেতে লাগবে।

বেগুন ভাপে

উপকরণ: বড় বেগুন ১টা, বড় পেঁয়াজ ১টা, রশুন ৬-৭ কোয়া, ক্যাপসিকাম ১টা, কাঁচালংকা ১-২টো, টম্যাটো কুচি, সরষের তেল, নুন, মিষ্টি স্বাদমতো।

প্রণালী: বেগুন ডুমো ডুমো করে কেটে নিন। ভাল করে ধুয়ে কড়াইতে ৫০ গ্রাম তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, রশুন বাটা, ক্যাপসিকাম কুচি, টম্যাটো কুচি, চেরা কাঁচালংকা দিন স্বাদমতো। নুন, মিষ্টি দিয়ে ঢেকে দিন। আঁচ কমিয়ে ২০ মিনিট ভাপে বসিয়ে রাখুন। বেগুন ভাপে তৈরি। গরম গরম পরিবেশন করুন।

জলপাইগুড়ির আড্ডা বিতর্ক ও ম্যাজিকে জমজমাট

মায়েদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় ছেলেমেয়েরাও হাজির হয় আড্ডাঘরে। কখনও হুড়োহুড়ি চলে, কখনও বা চুপ করে বসে মায়েদের গল্প শোনে, আলোচনা শোনে। এবারে আমাদেরই সদস্য রিঙ্কুর প্রস্তাবে একবাক্যে লাফিয়ে উঠল বাকি সবাই। রিঙ্কুর ছেলে যিশু, ক্লাস নাইনের ছাত্র, ভারী সুন্দর ম্যাজিক দেখানো শিখেছে। ওর এবারে একটু হাত পাকানোর ইচ্ছে হয়েছে, মানে মঞ্চে উঠলে ওকে কী কী ফেস করতে হতে পারে— এই আর কী। মাসিদের কাছে তাই আবদার। যিশুর হাতসাফাই দেখে চমৎকৃত সবাই, সকলেই ওকে ওর এই শিল্প

থেকে বেরিয়ে যেতে না যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আর-এক সদস্যের ছোট্ট মেয়ে অভ্রমিতাও এ দিন মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে একটু গান গাইবার সুযোগ পেয়ে খুব খুশি।

'মেয়েরাই নাকি মেয়েদের শত্রু'। সেই কবে থেকে চলে আসছে এই বাক্য। কিন্তু আমরা মেয়েরা কে কী ভাবি? ১৮ জুন রবিবার বিকেলের আড্ডায় বসেছিল তর্ক সভা। বিতর্ক বেশ জমে উঠেছিল এই নিয়ে। পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দিলেন অনেকেই। শেষমেশ সিদ্ধান্তটি হল এইরকম— আসলে কেউই কারও শত্রু নয়। বলাই বাহুল্য, শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবের সূচনা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য নিয়েই। একে অন্যের কথা শুনবে, তার মনের কোণে লুকিয়ে রাখা ভাবনা-দুঃখ-ভালবাসা কিছুক্ষণের জজন্য হলেও শেয়ার করবে, তার পর হালকা ফুরফুর মেজাজে বাড়ি ফিরে যাবে আর অধীর হয়ে অপেক্ষা করবে পরের আড্ডার দিনটির জন্য। না, কোনও সমাজ কল্যাণ বা দরিদ্র সেবা ইত্যাদি গালভরা মহৎ উদ্দেশ্যের ব্যাপার নেই, শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবের মূল ভাবনা একটাহ— 'প্রত্যেকে আমারা পরের তরে'। ক্লাব করার সাফল্য এই খানেই।

নিজস্ব প্রতিবেদন

সংগীত আর যোগা নিয়ে পাহাড়ে অশান্তির বিরুদ্ধে শান্তির প্রচারে শিল্পী

পাহাড়ে চলছে আগুনের খেলা। আজ এখানে আগুন, কাল সেখানে। আর এই সময়ে বিশ্ব যোগ দিবস ও সংগীত দিবসকে সামনে রেখে ইতিবাচক যোগের প্রচার শুরু হল বিভিন্ন মহল থেকে। আর এই সময় যোগ ও সংগীত দিয়ে শান্তির প্রচারে নেমেছেন এক শিল্পী। তাঁর মতে, যোগ ও সংগীত একসঙ্গে জুড়লে সব যোগ হবে, কোনও বিয়োগ হবে না। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার শিল্পী পালিত বছরের অন্য দিনের মতো রুটিন মেনে যোগপ্রাণায়াম ও সংগীত নিয়ে মেতে থাকছেন। গত ২১ জুন শিলিগুড়িতে বিশ্ব যোগ দিবস পালনের অঙ্গ হিসাবে শিল্পীদেবী শান্তির কথা বলে গেলেন। পাহাড়ের বর্তমান সময়ে যা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় রয়েছেন সংগীতশিল্পী শিল্পী পালিত। বহুদিন ধরে তিনি সংগীতচর্চা করছেন। রবীন্দ্রসংগীত থেকে শুরু করে আধুনিক, নজরুল, লোকগীতি সব মিলিয়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি সংগীত তাঁর গলার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলাদেশের ঢাকায় গিয়ে তিনি 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করলি রে বাঙালি, তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি' গানটি সহ আরও অনেক গান গেয়ে মাত করে দিয়ে আসেন।

শিলিগুড়িসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর গান গাইবার ডাক আসে। পুরস্কারও আছে অনেক। বিখ্যাত সংগীতশিল্পী বাপি লাহিড়ী শিলিগুড়ি এলে দু'বার তাঁর গান শুনে প্রশংসা করে যান। তা ছাড়া সংগীত ও কলা প্রচারের জন্য শিলিগুড়ি সুভাষপল্লির ফুলেশ্বরী নন্দিনীর তিনি যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক। প্রতিদিন তিনি তাঁর বাড়িতে শান্তি ও স্ট্রেসমুক্ত জীবনের জন্য যোগ ও সংগীতের প্রচার করেন। সকালে রোজই বিভিন্ন ধ্যান ও আসন করে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেন সংগীতচর্চা করতে। ২১ জুন বিশ্ব সংগীত দিবস ও যোগ দিবসেও তাঁর সেই সাধনায় খামতি থাকল না। আর তাঁর স্বামী কাঞ্চন পালিত রোজকার মতো এ দিনও স্ত্রীকে সংগীত ও যোগচর্চায় উৎসাহ দিয়ে গেলেন। শিল্পী জানালেন, চারদিকে যে আগুন ও অশান্তি চলছে, সেই বিয়োগ কমাতে যোগ করতে হবে। এর সঙ্গে সুস্থ সংগীত জুড়ে দিলে তা আরও অন্য যোগ তৈরি করে মানুষকে শান্তির পরিবেশে নিয়ে যেতে পারে। আর এই কাজটি নিঃশব্দে প্রচার করে

শিল্পীর সঙ্গে বাপি লাহিড়ী

যাচ্ছেন এই শিল্পী। বিভিন্ন মহলে প্রচারের বাইরে থেকে যোগ ও সংগীতের প্রচারও করে যাচ্ছেন তিনি। আর যোগ ও সংগীতের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবেশ ও ধ্বংসকে এড়ানোর এই দর্শনের প্রশংসা করেন আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির কর্মকর্তা সজলকুমার গুহ। শিল্পী রত্না ব্যানার্জিও এই ধরনের কাজের প্রশংসা করেন।

শিল্পীদেবীর সঙ্গে ফুলেশ্বরী নন্দিনী ও তার সম্পাদিকা কণিকা দাসও নানান কর্মসূচির মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতি ও শান্তির প্রচার করছেন। শিল্পীদেবী বলেন, আজ পাহাড় বলে নয়, অনেক ঘরেও শান্তির বড় অভাব। এই সময় সংগীত, ধ্যান ও প্রাণায়াম একটা বড় ওষুধ হতে পারে।

বাপি ঘোষ

সফল আবৃত্তিকার হওয়াই স্বপ্ন প্রত্যুষার

ছোট্ট প্রত্যুষা কখন যে বড় হয়ে গেল, আমরা মালবাসীরা বুঝতেই পারলাম না। আজ মালবাজারের গর্ব প্রত্যুষা চক্রবর্তী। এই বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত পৌর ছাত্র যুব উৎসবে সারা রাজ্যব্যাপী আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে সে।

সেই ছোট্টবেলা থেকেই মায়ের মুখে ছড়া শুনতে খুব ভালবাসত প্রত্যুষা। তারপর মাল শহরে কিশলয় স্কুলে নার্সারিতে ভরতি হওয়ার পর বড় মিসের কণ্ঠে ছড়া/কবিতা শুনতে শুনতে কবিতার প্রতি গভীর টান অনুভব করল ছোট্ট সে। শৈশবে একা বসে থাকলে নানান কবিতা-ছড়া পড়ত। যে সময় অন্য শিশুরা খেলা করত, ও সেই সময় কবিতার বই নিয়ে নাড়াচাড়া করত। এইভাবে কবিতার সঙ্গে একটা গভীর সম্পর্ক তৈরি হল প্রত্যুষার।

কেজি ক্লাসে সৃজনী আবৃত্তি সংস্থায় ওর শিক্ষা শুরু হল। তারপর থেকে একভাবে ও নিয়মিত চর্চা করে চলেছে। বিভিন্ন কর্মশালায় যোগ দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। শেখার সুযোগ হয়েছে পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, জগন্নাথ বসু, কাজল সুর, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো স্বনামধন্য আবৃত্তিকারদের কাছ থেকে।

কিশলয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ওর কবিতা শোনার জন্য সবাই অপেক্ষায় থাকত। যখন প্রত্যুষা প্রথম শ্রেণিতে, তখন রবীন্দ্রনাথের 'বিজ্ঞ' কবিতাটি বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত পৌর ছাত্র যুব উৎসবে পৌর এলাকায় শিশু বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছিল। সেই সময় থেকেই আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রত্যুষা চক্রবর্তীর নাম সর্বপ্রথম। আকাশবাণী শিলিগুড়িতে 'শিশু মহল' এবং 'কিশোর বিভাগ'-এ আবৃত্তি করেছে এবং বর্তমানে 'যুব বিভাগ'-এ আবৃত্তি করছে নিয়মিত।

মা মিতালি চক্রবর্তী ও বাবা প্রভাত চক্রবর্তী তাঁদের একমাত্র মেয়ে প্রত্যুষাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন। মায়ের কাছে ছড়া শুনে শুনে বড় হওয়া আর তারপরে সৃজনীতে আবৃত্তিশিক্ষা। এর পর কিশলয়ের বড় মিসের কাছে সঞ্চালনা ও আবৃত্তিচর্চা। কিছুদিন আগে কিশলয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পরিচালনায় 'শৈশবে ফিরে যাওয়া' শীর্ষক পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে ওর সঞ্চালনা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। বর্তমানে বিএ, এমএ করে বিএড করছে প্রত্যুষা। অবসর সময়ে সে বিভিন্ন কবির কবিতা পড়ে সময় কাটায়। রবীন্দ্রনাথ ওর প্রিয় কবি। সফল আবৃত্তিকার হওয়াই ওর জীবনের স্বপ্ন।

মীনাক্ষী ঘোষ

জীবন সংগ্রামে বেতশিল্পী আয়না দাস

সংসারধর্ম বড় কঠিন। সংসারধর্ম পালন করতে প্রতিটি পরিবারকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এমনই এক অসচ্ছল পরিবারকে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা আজ সচ্ছল করে তুলেছেন জলপাইগুড়ি শহরের বৈরাগী পাড়ার প্রবীণা গৃহবধূ আয়না দাস। তাঁর পরিচয়, তিনি একজন বাঁশ ও বেতশিল্পী। দীর্ঘ বছর ধরে বাঁশ ও বেতের নানান সামগ্রী তৈরি করে পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আয়নাদেবী। বেতশিল্পের উপর নির্ভর করেই তিন ছেলেকে মানুষ করেছেন। এক সময়ের হতদরিদ্র আয়নাদেবীর পরিবার আজ একটি সচ্ছল পরিবার। শিল্পী আয়নাদেবী জানান, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে আসার পর এই পরিবারকে কঠোর আর্থিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে কাটাতে হচ্ছিল। তখন স্বামীর যৎসামান্য আয়ে একটি বড় পরিবারের ভরণপোষণ করা এক বড় সংগ্রাম হয়ে ওঠে। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তাঁকেও কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু কাজ পাবেন কোথায়! সে সময় আয়নাদেবীর দাদা শিবু দাস বেতের একজন বড় শিল্পী ছিলেন। দাদার কাজ দেখতে দেখতেই এই কাজ করার দক্ষতা আয়ত্ত করে নেন তিনি। নিজের বাড়িতেই শুরু করে দেন বেতের নানান সামগ্রী তৈরির কাজ। এগিয়ে আসেন স্বামী সুনয়ন দাসও।

সুনয়নবাবু আগে থেকেই বেতের কাজ পারতেন। তাই স্ত্রীর সঙ্গে কাজ শুরু করার পর খুব সহজেই দু'জনে মিলে বেতের নানান সামগ্রী তৈরি করতে লাগলেন। জলপাইগুড়ি শহরের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিসহ গোটা রাজ্য, এমনকি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ছাড়িয়ে বেতের সামগ্রী পাড়ি দিতে থাকে আন্তর্জাতিক বাজারেও। আয়নাদেবীরা এর পর নিজেদের সামগ্রী বিপণনের জন্য গড়ে তুললেন 'আয়না দাস অ্যান্ড সনস' নামে প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এলাকার বিভিন্ন মহিলার স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বেতের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে অনেক মহিলা এখানে বেতের কাজ শিখে নিজেরাই স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি উদ্যোগে হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণশালায় প্রশিক্ষক হিসাবে ডাক পান আয়নাদেবী। আয়না দাস বলেন, তাঁর তৈরি বাঁশ ও বেতের সামগ্রীর যথেষ্টই চাহিদা রয়েছে। তিনি এই কাজ করে আজ নিজের সংসারকে স্বপ্নের মতো করে গড়ে তুলেছেন। তাঁর এই কাজের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য সম্মান ও পুরস্কারও পেয়েছেন আয়নাদেবী। যতদিন পারবেন, ততদিন এভাবেই নিজের শিল্পধর্ম চালিয়ে যাবেন বলে জানান বছর পঁয়ষট্টির এই প্রবীণা বেতশিল্পী।

শুভ্রজিৎ পোদ্দার

কেজো মানুষের কাহিনি

দুঃস্থ মেধাবীদের পাশে বছরভর থাকেন 'অখ্যাত' তৃণমূলী মদন

শিলিগুড়িতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতেই প্রতি বছর দুঃস্থ ও মেধাবীদের পাঠ্যপুস্তক প্রদান করে নজির তৈরি করছেন এক তৃণমূল নেতা তথা সমাজসেবী। শুধু বই কিনে দিয়ে নয়, হতদরিদ্র কিছু মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে প্রতি মাসে টিউশন ফি দিয়ে পড়ার খরচ চালিয়েও ওই সমাজসেবী রীতিমতো আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠছেন। আবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিশুসাথী' প্রকল্প অনুযায়ী অসুস্থ শিশুদের হার্টের চিকিৎসা থেকে শুরু করে অন্য চিকিৎসার খরচ জোগাড় করে দিয়েও তিনি ক্রমশ ব্যতিক্রমী হয়ে উঠছেন। ওই সমাজসেবী তথা তৃণমূল নেতার নাম মদন ভট্টাচার্য।

তিনি কোনও কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি বা বিধায়ক, সাংসদ বা মন্ত্রীও নন। তিনি একজন তৃণমূল নেতা, এখন জেলা স্কুল ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান মাত্র। কিন্তু শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে কোথাও দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী পড়ার খরচ না চালাতে পারলেই তাঁর কাছে ছুটে যাচ্ছে। আবার তিনিও তাদের খবর জোগাড় করে দৌড়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াচ্ছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে লাগাতার তিনি এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

চলতি বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বার হতেই মদনবাবু পাশে দাঁড়ালেন অনুরাধা কামাত, কৌশিক শীল, অনামিকা সরকার, পূজা সরকার ও হেনা খাতুনের পাশে। অনুরাধা মাধ্যমিকে পেয়েছে ৫৭৮ নম্বর, তার বাবা সামান্য বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। কৌশিক শীলের বাবা ফুটপাথে সামান্য সেলুনকর্মী, তার প্রাপ্ত নম্বর ৬১০। সামান্য দিনমজুরের মেয়ে অনামিকা সরকার ৫৭৮ পেয়ে সকলের নজর কাড়ে। হেনা খাতুনের প্রাপ্ত নম্বর ৪৭১, তার বাবা নেই, মা পরিচারিকা। পূজা সরকারের বাবা দিনমজুর, তার প্রাপ্ত নম্বর ৫৯৮। এরা সকলেই মাধ্যমিক পাশ করার পর একাদশ শ্রেণিতে কীভাবে পড়বে চিন্তা করতে থাকলে মদনবাবু তাদের হাতে বই কিনে কিছু টাকা দিয়েছেন।

অন্য দিকে উচ্চমাধ্যমিকে মাটিগাড়ার কৃষকের ছেলে চন্দন সিংহ ৪৩৬ পেয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলমিস্ত্রির দুই যমজ ভাই বিশ্বজিৎ সিংহ ও সুদীপ সিংহ ৪১৫ ও ৪১৮ পায়। রিকশাচালকের ছেলে আকাশ দাস উচ্চমাধ্যমিকে পায় ৪১০। একইভাবে রতন সরকার— ৩৭২, জয় পাল— ৪৫৭, সবাই খুব গরিব। তাদের সকলের পাঠ্যপুস্তক কিনে দিয়ে হাসি ফুটিয়েছেন মদনবাবু।

গত বছরও মাধ্যমিকে ৫০ জন ও উচ্চমাধ্যমিকে ৩০ জন কৃতীর পাশে দাঁড়ান তিনি। তার আগের বছরও এই কাজ করেছিলেন তিনি। ২০০০ সাল থেকে তিনি এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ধারাবাহিকভাবে। সেই সময়কার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নমিতা দেবনাথ, গৌরী সরকার-সহ কয়েকজন আজ চাকরি করছেন। কেউ স্কুলের শিক্ষিকা, কেউ বা অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। অথচ একসময় তাঁদের আর্থিক সংকটে বই কেনার পয়সা ছিল না। মদনবাবু তাদের পাশে সাধ্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছেন।

একদিকে এইসব দুঃস্থ ও মেধাবীর পাশে ধারাবাহিকভাবে দাঁড়ানো, অন্য দিকে গোবিন্দ সরকার, মিথি পাল, বিদিশা দাস, সায়ন্তনি পালদের মতো দুঃস্থ শিশুদের মুখ্যমন্ত্রীর 'শিশুসাথী' প্রকল্প অনুযায়ী হার্টের অপারেশন থেকে শুরু করে অন্য চিকিৎসা দিয়ে তিনি সহায়তা করেছেন।

পার্থ দেবরায়, অনিমেষ জয়ধাড়া, হাদিশা আখতারি, রহিমা খাতুন, বনশ্রী পালদের মতো দুঃস্থ ও মেধাবীরা তাঁর কাছ থেকে প্রতি মাসে টিউশন ফি সংগ্রহ করে প্রাইভেটে পড়ছে।

মদনবাবুর হিসাবে, প্রতি মাসে তাঁর এইসব সামাজিক কাজ করতে কমপক্ষে কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি কীভাবে এই টাকা সংগ্রহ করেন?

তাঁর পরিষ্কার কথা, 'আমার এক ভাগনে রয়েছেন। তাঁর নাম সন্দীপ ভট্টাচার্য। তিনি থাকেন দুবাইতে। তিনি সেখানকার এয়ারলাইনসের কেবিন ক্রু। সেই ভাগনে আমাকে ছোটবেলা থেকে সামাজিক কাজ করতে দেখে আসছেন। তারপর তিনি নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখন দুবাই থেকে নিয়মিত আমায় সাহায্য পাঠান। সেই টাকাতেই আমার সামাজিক কাজ চলে। এই সামাজিক কাজ চালানো আমার নেশা।'

কিন্তু কীভাবে তাঁর মাথায় এই নেশার উৎপত্তি হল, প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'ছোটবেলায় আমার বাবা প্রয়াত মন্টু ভট্টাচার্যকে সামাজিক কাজ করতে দেখেছি। তারপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অনুপ্রেরণা। মুখ্যমন্ত্রীর কাজ দেখে উৎসাহিত হই। এখন পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিয়মিত সামাজিক কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ফলে চলছে আমার এই কাজ।'

ফুলবাড়ির অসহায় বৃদ্ধা মিনতি বর্মনকে নিয়মিত চাল, ডাল কিনে দেওয়া ছাড়াও আরও বহু মানুষের পাশে তিনি নিয়মিত দাঁড়িয়ে চলেছেন। জাতীয় স্তরে সোনাজয়ী দীপ্তি পালকে খেলতে যাওয়ার জন্য টাকা দেওয়াও তাঁরই কৃতিত্ব। এভাবে বহু উদাহরণ তাঁর ঝুলিতে রয়েছে।

আর মজা হল, ভোটের আগে নয়, সারা বছর ধরে চলে তাঁর এই সামাজিক কাজ। এই জন্য তাঁকে কোনও কোনও নেতা সহ্য করতে পারেন না বটে, কেউ কেউ তাঁর নামে নিন্দেও করে যান। তিনি সেসব শুনে পরিষ্কার বলেন, 'হাতি চলে বাজার, কুত্তা ভোকে ভাগাড়। আমি মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে চাঁদা তুলি না। কোনও ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও অর্থ তুলি না। দুঃস্থদের পাশে থাকতে আমার ভাল লাগে। এটা আমার নেশা। তাই এই কাজ করি। যে ক'দিন বাঁচব, মানুষের জন্য কাজ করে যাব। তবে রাস্তাঘাটে অবসরপ্রাপ্ত অনেক বৃদ্ধ যখন জড়িয়ে ধরে বলেন, কাজটা চালিয়ে যা। দরকার হলে বলিস। মাসে মাসে পেনশন থেকে এক হাজার, দু'হাজার টাকা করে দিতে চাই। দুঃস্থ ও মেধাবীদের জন্য কাজটা বন্ধ করিসনে। তখন আরও উৎসাহিত হই।'

নিজস্ব প্রতিবেদন

১২৯ বছরের বার অ্যাসোসিয়েশন বয়ে বেড়াচ্ছে অবহেলার জীর্ণতা

কোচবিহার রাজপ্রাসাদ থেকে গয়না চুরি নিয়ে মামলা! শুনলে অবাক হতে বয় বইকি। আজ থেকে ১০১ বছর আগে অর্থাৎ ১৯১৬ সালে কোচবিহার রাজপ্রাসাদ থেকে গয়না চুরি সংক্রান্ত একটি মামলা সত্যিই করা হয়েছিল রাজপরিবারের পক্ষ থেকে। অভিযোগের সত্যতা যা-ই হোক না কেন, ষড়যন্ত্রমূলক এই মামলাটিতে অভিযুক্ত ছিলেন মহারানি সুনীতাদেবীর ছোট বোন সাবিত্রীদেবীর পরিবার। সাবিত্রীদেবীর স্বামী কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সম্পর্কে ছিলেন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের তুতো ভাই। পেশায় ছিলেন দক্ষ ব্যারিস্টার। আরও অবাক করার বিষয় হল, সে সময় সাবিত্রীদেবীর হয়ে মামলা লড়তে আটজন ব্যারিস্টার নিয়ে কোচবিহারে এসেছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। কোচবিহারের জজ কোর্টে উঠেছিল সেই মামলা।

সে সময় কোচবিহার রাজ্যের বিচারব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। সেটা ভারত সরকারের আইনি ব্যবস্থার অধীনে ছিল না। কোচবিহার রাজ্যে ছিল নিজস্ব হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, যাকে বলে মহারাজা'স কাউন্সিল। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময় ১৮৭৭-৭৮ সালে সাগরদিঘির উত্তর পাড়ে করিন্থিয়ান ও গথিক শৈলীতে বড় বড় থামের উপর একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হয়। সামনে সুন্দর একটি পোর্টিকোসহ তৈরি হয় দুইপাশে দুটো উইং। এই সেন্ট্রাল

বিল্ডিংটি ব্যবহার করা হত কাউন্সিল হাউস হিসাবে। শহরের মধ্যেই জজ কোর্ট, হাই কোর্ট থাকার কারণে সেখানে আইনজীবীদের বসার জন্য একটি বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

১৮৮৮ সালে স্থাপিত হয় কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশন। তৎকালীন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর বার অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করার জমি দান করেন। সাগরদিঘির উত্তর-পূর্ব কোণে ওই জমিতে তাঁরই আর্থিক সাহায্যে তৈরি করা হয় কাঠের প্ল্যাংকিং করা টিনের চাল দেওয়া বেড়ার ঘর। সে সময়ের এই বার অ্যাসোসিয়েশন। ১৯০০ সালের হিসেব অনুযায়ী দেখা যায়, বার-এ ফার্স্ট গ্রেড প্লিডার ছিলেন ৩০ জন। সেকেন্ড গ্রেড প্লিডার ছিলেন ২৫ জন। মোক্তার ৩১ জন এবং রেভিনিউ এজেন্ট ১৯ জন। এতদিনে কোর্টের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে উকিলদের বসার ও কাজ করার উপযোগী একটা পাকাপাকি জায়গার ব্যবস্থা হল। এর পর ১৯১৪ সালের ১১ মে জিতেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার বার লাইব্রেরির বর্তমান ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বর্তমানে নতুন ভবনটিরও বয়স হল ১০৩ বছর।

১২৯ বছরের পুরনো এই বারের প্রতিটি ইটে গাঁথা রয়েছে রাজ-আমল থেকে বর্তমান আমলের সব মামলার ইতিহাস।
রাজ-আমলে নানান মামলার মধ্যে একটি মামলার কথা না বললেই নয়, তা হল মাফিজ শেখের ফাঁসি। ১৯৪২ সালের ১১ ডিসেম্বর কোচবিহার রাজ্যের তুফানগঞ্জের নাককাটি গ্রামে বসন্ত সরকার বলে একজন খুন হয়। ঘটনার তদন্তে ৫ জন ধরা পড়ে। কোচবিহার হাই কোর্টে চলে সেই মামলা। অ্যাডভোকেট জেনারেল বিনোদবিহারী দত্ত সেই মামলায় মাফিজ শেখের ফাঁসিই চেয়েছিলেন। অন্য অভিযুক্তদের পক্ষে-বিপক্ষে লড়েছিলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন আইনজীবী। অবশেষে ১৯৪৩ সালের ২৮ আগস্ট রায় ঘোষণা করা হয়। তিন অভিযুক্ত ছাড়া পায়, একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ফাঁসির হুকুম হয় মাফিজ শেখের। ১৯৪৪ সালের ২৪ মার্চ কোচবিহারের জেলে ফাঁসি হয় তার। রাজনগরে এটাই ছিল শেষ ফাঁসি।

এর পর ১৯৪৭ সাল, ভারত স্বাধীন হয়। কোচবিহার রাজ্য যুক্ত হয় ভারতে। পরবর্তীতে রাজ্য থেকে পরিণত হয় পশ্চিমবঙ্গের একটি সামান্য জেলায়। রাজ্যের হাই কোর্ট তার গরিমা হারিয়ে জেলা

দায়রা আদালতে পরিণত হয়। বাকি সব চলে যায় কলকাতার অধীনে।

এ ধরনের বহু ঘটনার সাক্ষী এই বার অ্যাসোসিয়েশন। ১৯৭৪ সালে সিআরপিএফ-এর গুলিচালনায় মৃত্যু হয় জেঙ্কিন্স স্কুলের শংকর চক্রবর্তীর। সেই ঘটনার সূত্র ধরে ২৭ আগস্ট একদল উন্মত্ত জনতা জজ কোর্ট, ইনকাম ট্যাক্স অফিস, রেকর্ড রুমে আগুন লাগিয়ে দেয়। জজ কোর্টের অসাধারণ স্থাপত্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরবর্তীতে সেখানে নতুন ভবন নির্মাণ হয় ঠিকই, কিন্তু সে দিন কিছু মানুষের অবিমৃশ্যকারিতায় পুড়ে ছাই হয়ে যায় কোচবিহারের ইতিহাস। তাদের আক্রোশ থেকে রক্ষা পায়নি বার অ্যাসোসিয়েশনের ভবনও। দোতলার টিন দেওয়া অংশ পুড়ে ছাই হয়। পরবর্তীকালে এ জন্য কমিশন গঠিত হয়। তারা বার অ্যাসোসিয়েশনের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করে সরকারকে তা দিতে বলে। সেই অর্থে নিচের ঘর সারাই হয় এবং দোতলার অংশ পুনর্নির্মাণ করা হয়।

আর-একটি মামলা, যা কোচবিহারবাসীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল তা হল কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন চুরির ঘটনা। ১৯৯৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে চুরি হয় মদনমোহন। এই কেসে খুব সুন্দর তদন্ত হয়েছিল বলে জানালেন কেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাডভোকেট বিবেক দত্ত। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেছিলেন অরুণ ভট্টাচার্য, অম্বিকাচরণ রায়। কোচবিহার আদালতে দোষীদের সাজা ঘোষণা হয়। তারপর হাই কোর্টে আপিল করা হয়। কেসটা প্রথমে জলপাইগুড়ি ও পরে বারাসত কোর্টে যায়। কেসটি পুনরায় রিমান্ডে আসে কোচবিহারে ফ্রেশ ট্রায়ালের জন্য। নারায়ণ সেনের সাজা হয়। কিন্তু আসল অপরাধী অসীম ভট্টাচার্য পালিয়ে যায়।

বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলার মধ্যে ১৯৫১-র খাদ্য আন্দোলনের মামলা, ১৯৭৬/৭৭ সালে মাথাভাঙার রেবতী ভট্টাচার্য মার্ডার কেস— এগুলো অন্যতম। ১৯৮৫ সালে রাজবাড়ির সম্পত্তি নিয়ে একটি মামলা হয়, চলে ১৯৮৭ অবধি। সেই মামলায় সাক্ষী দিতে এসেছিলেন কোচবিহারের শেষ মহারাজা বিরাজেন্দ্রনারায়ণ।

পরবর্তী দশকে আর-একটি কেস, যেটাতে কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের লড়াকু মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তা হল ২০০৫ সালের গ্রেটারের মামলা। সেই ঘটনায় অ্যাডিশনাল এসপি-সহ ৩ জন পুলিশ অফিসার মারা যায়। অভিযুক্ত ৪৭ জন আসামি ২০১৫ সালে সকলে বেকসুর খালাস পায়। সেবার মেমো অব অ্যারেস্ট মামলাটির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

কোচবিহারের কোর্ট চত্বরে প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে ভিড় করে হাজার হাজার লোক। অর্ধেকের বেশি আসে মামলা-মকদ্দমার কাজে। শতাব্দীপ্রাচীন সেই বার-এ ঢুকে দেখি, সেখানে চরম ব্যস্ততা। বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য তথা আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার জানালেন পুরনো কিছু কথা। ভারতবর্ষের যেসব নতুন আইন আমরা এখন দেখতে পাই, কোচবিহার রাজ্যে সেসব অনেক আগে থেকেই ছিল বলে জানালেন তিনি। তাঁর কথায়, আমরা এখন ক্রুয়েলটি টু দি অ্যানিমেলের কথা বলছি, কিন্তু আজ থেকে ১০০ বছর আগে কোচবিহার রাজ্যে তা নিয়ে আইন ছিল। রাজ্যে শাসনব্যবস্থাও ছিল অনেক উন্নত। ১৯৭৩ সালে ভারতে জুডিশিয়ারি আর এগজিকিউটিভ ভাগ হয়েছে। তার অন্তত ২০০ বছর আগে কোচবিহারের মহারাজা তাঁর রাজ্যে এই শাসনব্যবস্থা ভাগ করে দিয়েছিলেন।

ঐতিহ্যশালী এই শহরে মামলা লড়তে শুধু চিত্তরঞ্জন দাশ নয়, এখানে বিভিন্ন সময় মামলা লড়তে এসেছিলেন জে এন রায়, অতুল গুপ্ত, গুণদা সেন, বিসি চ্যাটার্জি, ফজলুল হক, খোদা বক্স, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, রাধাবিনোদ পাল, জেপি মিটার, কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি পিএন মুখার্জি-সহ আরও অনেকে। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার বিখ্যাত চরিত্র 'জটায়ু' সন্তোষ দত্ত নিজে ছিলেন বার অ্যাট ল, তিনিও মামলা লড়তে এসেছিলেন।

কোচবিহারের বার-এ ছিলেন বিখ্যাত সব লইয়ার। জজ কোর্টের বিচারপতি তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় স্বনামধন্য ছিলেন। অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য, হেমন্তকুমার রায় বর্মা, হিমাংশুশেখর মুস্তাফি, বিনোদবিহারী দত্ত, গোবিন্দমোহন দত্ত, তারাপদ মুখার্জি (পরে জজ হন), তারাপদ বিশ্বাস, অজিত রায়, নীহারকান্তি রায়, লক্ষ্মী সেহানবিশ, শ্যামাপ্রসাদ সেহানবিশ— প্রত্যেকেই বেশ নামকরা ছিলেন। ধরণীশংকর ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করে কলকাতা হাই কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করলেও ১৯১৯ সালে কোচবিহার ফিরে আসেন। কোচবিহার রাজ্য ভারতভুক্তির সময় তিনি ছিলেন লিয়াজোঁ অফিসার। ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী অজিতভূষণ মজুমদার। শেষ জীবনে তিনি কলকাতা হাই কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন।

যতদিন কোচবিহারে রাজশাসন ছিল, ততদিন নিয়ম করে সেখান থেকে কিছু অর্থসাহায্য আসত। তা-ই দিয়ে আইনের বইপত্র কেনা হত। কিন্তু কোচবিহারের ভারতভুক্তি ও পশ্চিমবঙ্গভুক্তির পর সেই অনুদান বন্ধ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিল মাঝেমধ্যে কিছু সাহায্য করে থাকে। তাতে কিছু বইপত্র কেনা হয়। সাংসদ তারিণী রায়, বিধায়ক অক্ষয় ঠাকুর তাঁদের ফান্ড থেকে অর্থসাহায্য করেছেন। তা-ই দিয়ে উপরে ঘর করা হয়েছে। পিছনে দোতলা করা হয়েছে। এখনও তার উদ্‌বোধন হয়নি। বর্তমান সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়কেও বলা হয়েছে, তিনি ১০ লক্ষ টাকা সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গেল। বার-এর ১২৫ বছর উপলক্ষে সামনে একটি তোরণ করা হয়েছে। উপরে একটি ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছে, বার-এর বাকি খরচ চলে সদস্যদের চাঁদার টাকা দিয়ে।

ওকালতনামা অনুযায়ী, বর্তমানে বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যসংখ্যা ২৪১। এঁদের মধ্যে মহিলা রয়েছেন ২৪ জন, জানালেন আইনজীবী রাজু রায়। বর্তমানে বার-এর প্রেসিডেন্ট হলেন প্রসেনজিৎ বর্মন। সেক্রেটারি আবদুল জলিল আহমেদ জানালেন, খুবই ঐতিহ্যবাহী বার আমাদের কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশন। শুধু কোচবিহার নয়, গোটা ভারতের আইন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অনেক আইনজীবী মামলা করতে আমাদের এখানে এসেছেন। পৃথিবীর আদিম ব্যবসা হচ্ছে ওকালতি। সমাজকে ঠিক রাখতে গেলে, আইনকে ঠিক পথে চালাতে গেলে এঁদের ছাড়া উপায় নেই। না হলে সমাজে অরাজকতা দেখা দিত। নতুন প্রজন্মের উচিত এই পেশায় আসা। তবে আজকাল আর তেমন নজরকাড়া মামলা হয় না বললেই চলে।

কয়েক দশক আগেও সামাজিক নানা কাজে এগিয়ে আসতে দেখা যেত বার অ্যাসোসিয়েশনকে। কিন্তু ইদানীং আর কোনও সমাজসেবামূলক কাজে তাঁদের দেখা যায় না। বার-এর ৬টি ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ হয় না ঠিকমতো তা ঘরগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সদস্য জানালেন, বার লাইব্রেরিতে প্রায় ২০টির মতো আলমারি রয়েছে। কিন্তু বইয়ের তেমন কোনও যত্ন নেওয়া হয় না। নতুন প্রকাশিত বইও কেনা হয় খুব কম। ঘরে লাইন দিয়ে উই ধরেছে, কিন্তু কারও সে সম্পর্কে তেমন গরজ নেই। খুব দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে ঐতিহ্যবাহী এই প্রাচীন ভবন খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। এ কথা সত্যি যে ভবনের চারদিকে অবহেলার ছাপ স্পষ্ট। এ ব্যাপারে বার-এর সদস্যদের একমত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদেরকেই নিতে হবে। ১২৯ বছর পূর্ণ করা কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশন আজও নিজের মধ্যে ইতিহাসকে বহন করে চলেছে নীরবে।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

অরণ্য মিত্র

দীননাথ চৌহানকে বকশিশ দিয়ে রিসর্ট থেকে ভাগিয়ে দিলেন দাসবাবু। সুরেশ কুমার জানাল যে, রিসর্টে হামলা হওয়ার গন্ধ পেয়েছেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। আরেকটি রিসর্টে কনক দত্ত আর পরি ঘোষাল অপেক্ষা করছিলেন। দেবমালা যাদব তাঁদের জানাল তার পরিকল্পনার কথা। সে একা যেতে চায় দীননাথের রিসর্টে। ব্যর্থ হলে নদী ধরে পিছন দিক দিয়ে নজরদারি চালাতে হবে রাতে। শুটিং দেখতে গিয়ে দীননাথ আর মাইকেল সুরাপানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের পথ ধরে। এবার তাদের চোখে পড়ল অবাক করা দৃশ্য। কাহিনি এখন এক ধুন্ধুমার পরিণতির জন্য অপেক্ষা করে আছে, তবে?

১০৩

রিসর্টের চারপাশ একবার ঘুরে নিয়ে দাসবাবু নিশ্চিত হলেন। গ্রীষ্মের লম্বা বিকেল আর একটু পরে ফুরিয়ে যাবে। তাঁর সঙ্গে দীননাথ চৌহান ঘুরছিল এতক্ষণ। দাসবাবু এবার তাঁকে বললেন, 'তুমি এবার চলে যাও দীননাথ। কালকের মতো আজও রাতে কাউকে রাখার দরকার নেই। আমাদের পুরো টিম চলে এসেছে। তুমি একদম কাল সকালে চলে এসো।'

দীননাথ খুশি হল। টানা তিন দিন গোটা রিসর্টটা বুক করেছে এরা। মালিক বারবার বলে দিয়েছেন সবসময় সঙ্গে থাকতে। কিন্তু গতকাল যে কোনও পাহারাদারও রাতে ছিল না, সেটা মালিক জানলেও দীননাথ তাঁকে বলেছিল যে, সে নিজে ছিল। কথাটা একেবারেই মিথ্যে। আজকে একটু আগে ফোন করেছিল মালিক। দীননাথ নিজে রাতে থাকবে জানিয়ে আশ্বস্ত করেছিল মালিককে। রাতে থাকার জন্য মালিক এক্সট্রা কিছু দিয়ে থাকেন। সেটা না থেকে পাওয়া গেলে মন্দ কী?

'মালিককে কিন্তু বলবেন না যে রাতে কেউ থাকল না।' দীননাথ হাত কচলে বলে।

দাসবাবু একটু হেসে বললেন, 'সে নিয়ে ভেবো না। তবে লক্ষ করছি যে, তুমি আর ইংরিজি বলছ না। ইংরিজি ছেড়ে দিলে নাকি?'

'আসলে হল কী— ওই ম্যাডাম আমার ইংলিশ ডায়ালগ শুনে হাসলেন। বললেন ইংলিশ না বলতে। শুনে খারাপ লাগল। বাট আমি মেনে নিলাম।'

'এদিকে কোথায় সিনেমার শুটিং হচ্ছে শুনলাম?'

'নদীর পাড়ে। রেল ব্রিজ আছে— এই নদীটাই ব্রিজের তলা দিয়ে রান করে, বুঝলেন? আমি দেখব তো শুটিং!'

'তাহলে আর দেরি কোরো না।' দাসবাবু পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে একটা পাঁচশোর নোট গুঁজে দিলেন দীননাথের হাতে। 'শুটিং দেখো। ফুর্তি করো। কাল সকাল আটটার দিকে এলেই চলবে।'

এই বকশিশটার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল দীননাথ চৌহান। এবার সে এক গাল হেসে বলল, 'নট টেক টেনশন সার। আই রিটার্নিং এইট মর্নিং! থ্যাঙ্কিউ!'

দীননাথ বেরিয়ে গেল। তার মোটরবাইকের শব্দ মিলিয়ে যেতেই দাসবাবু দ্রুতপায়ে রিসর্টের পিছনে গাছপালা ঘেরা এলাকাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। মায়াঙ্ক আর মনামি গতকালই এসেছে। শুক্লা দাসকে নিয়ে রাজা রায় এসেছে দুপুরের আগেই। বাকি ছিল সুরেশ কুমার। আধ ঘণ্টা হল একটা গাড়ি নিয়ে সে-ও পৌঁছে গিয়েছে। সন্ধের মুখে আরও দু'জন আসবে অস্ত্র নিয়ে। বুদ্ধ ব্যানার্জির কড়া নির্দেশ— সিকিয়োরিটি ছাড়া তারা যেন রিসর্টে না থাকে। দাসবাবু চাইছিলেন, সিকিয়োরিটির লোক দুটো আসার আগে দীননাথ যেন রিসর্ট ছেড়ে চলে যায়। ওদের সঙ্গে ইনসাস রাইফেল থাকবে। দীননাথের সামনে সেসব বার করা সম্ভব নয়।

নিজের পকেটে রাখা গ্লকটার উপর হাত বুলিয়ে সুরেশ কুমারকে ডাকলেন দাসবাবু। সে

নদীর কাছটায় দাঁড়িয়ে মন দিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ করছিল। সুরেশ কুমারের মতো শার্প শুটার খুব কম পাওয়া যায়। কিন্তু তার প্রিয় অস্ত্র কোল্ট রিভলভার।

‘কী দেখছিলে?’

দাসবাবুর প্রশ্নে সুরেশ কুমার হাত তুলে নদীর ওপারটা দেখাল।

‘এনিথিং রং?’

‘ভালনিয়ারেবল!’ সুরেশ কুমার সামান্য হেসে জবাব দিল, ‘ওদিক থেকে অ্যাটাক হলে ঝামেলায় পড়ব।’

‘অ্যাটাকের কথা আসছে কেন?’ দাসবাবু একটু বিস্মিত হলেন, ‘ডুয়ার্সে এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিপক্ষ বলতে তো কেউ নেই সুরেশ!’

‘তা নেই। কিন্তু উনি বারবার সিকিয়োরিটি রাখার উপর জোর দিচ্ছেন। ইন ফ্যাক্ট, দু’জন লোককেও আমরা আসতে বলেছি আজ।’ সুরেশ কুমার বিড়বিড় করে বলল, ‘ওঁর কাছে নিশ্চয়ই কোনও ইনফর্মেশন আছে।’

‘রাইট!’ দাসবাবু মাথা নাড়লেন, ‘বুদ্ধ ব্যানার্জি অপ্রয়োজনে কোনও নির্দেশ দেন না। কিন্তু এদিক থেকে কেউ অ্যাটাক করতে এলে তাকে নদী পেরিয়ে অন্তত এই এলাকাটায় ঢুকতে হবে। তার মানে তুমি বলছ যে, লোক দুটোকে আমরা এদিকেই রাখব?’

‘হুঁ।’ সুরেশ কুমার চিন্তিত সুরে বলল, ‘আজ আকাশে চাঁদ থাকবে। মোটামুটি আলোও থাকবে। কেউ নদী পেরিয়ে এদিকে আসতে চাইল চোখে পড়ে যাবে তাহলে। আশা করি, কেউ স্নাইপার নিয়ে হামলা করবে না।’

‘স্নাইপার!’ দাসবাবু এবার হেসে ফেললেন, ‘ডুয়ার্সে স্নাইপার আর টেলিস্কোপ লাগানো লং রেঞ্জের রাইফেল একটা লোকের কাছেই আছে। তার নাম পল অধিকারী। কিন্তু সে কেন আমাদের মারতে আসবে?’

সুরেশ কুমার কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে কী জানি ভাবতে লাগল।

১০৪

দেবমালা যাদব রিসর্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের শোভা দেখছিল। আধ ঘণ্টা হল এখানে এসেছে সে। কনক দত্ত কিংবা পরি ঘোষাল— কেউই নিজের ঘর থেকে বার হয়নি। দেবমালা যেন অচেনা কেউ। তবে একই রিসর্টে পাশাপাশি ঘরে থাকলে আলাপ তো হতেই পারে। বারান্দায় এসে কনক দত্তর ফোনে একটা এসএমএস ছুড়ে দিয়ে সে তাই অপেক্ষা করছিল। কয়েক মিনিট পর কনক দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ানো দেবমালাকে বললেন, ‘হাই!’

‘হ্যালো!’ দেবমালা চমৎকার অভিনয় করল। কনক দত্ত গুটিগুটি পায়ে তার পাশে এসে ফিসফিস করে বললেন, ‘শুক্লা দাস হাতের কাছে এসে বসে আছে। কোনও প্ল্যান?’

‘শুটিং দেখার নাম করে আমরা সন্ধের পর বার হতেই পারি।’ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল দেবমালা, ‘তারপর সেই রিসর্টের দিকে যাওয়া যেতে পারে।’

‘আমাদের ঢুকতে দেবে কেন?’ কনক দত্ত এদিক-ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, ‘গোটা রিসর্ট কেউ বুক করে রেখেছে। ওরা কাউকে অ্যালাও করবে না।’

‘যদি আমি একা যাই?’

‘একা?’ একবার দেবমালার মুখের উপর নজর বুলিয়ে বিস্ময়ের সুরে বললেন কনক দত্ত, ‘একা যাওয়ার অর্থ?’

কনক দত্ত কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। গোটা একটা রিসর্ট বুক করে রাখার অর্থ হল, শুক্লা দাস সেখানে একা নেই। কিন্তু দেবমালা যে রিসর্টের ভিতরে যেতে পারবে, তারও নিশ্চয়তা নেই কোনও। হয়ত গেট থেকেই তাকে বিদেয় করে দেবে রিসর্টের নাইটগার্ড। সে ক্ষেত্রে দেবমালাকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হবে।

‘একা গাড়িটা নিয়ে যাব। বলব, কোথাও জায়গা পাচ্ছি না। একটা রাত থাকার অনুমতি চাইছি। একা একজন মেয়েকে দেখে হয়ত রাজি হলেও হতে পারে।’

‘সেটা মানবিকতার প্রশ্ন দেবমালা!’ কনক দত্ত বিরক্তির সুরে বললেন, ‘ওখানে যারা আছে, তারা ক্রিমিন্যাল। ওদের চোখে ধুলো দেওয়াটা অত সোজা নয়।’

‘চেষ্টা তো করাই যায়। হয়ত ভাগিয়ে দেবে— কিন্তু কিছু ইনফর্মেশন তো পেতেই পারি। অ্যাট লিস্ট, আর কে সেখানে আছে, সেটা জানা গেলেও যেতে পারে।’

কনক দত্ত কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। গোটা একটা রিসর্ট বুক করে রাখার অর্থ হল, শুক্লা দাস সেখানে একা নেই। কিন্তু দেবমালা যে রিসর্টের ভিতরে যেতে পারবে, তারও নিশ্চয়তা নেই কোনও। হয়ত গেট থেকেই তাকে বিদেয় করে দেবে রিসর্টের নাইটগার্ড। সে ক্ষেত্রে দেবমালাকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হবে। তবে, একটা চান্স সে নিতেই পারে।

‘এলাকার ম্যাপটা স্টাডি করেছ?’ কনক দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, ‘যেখানে শুটিং হচ্ছে, সেখান থেকে নদীর পাড় ধরে কিন্তু রিসর্টের পিছন দিকটায় পৌঁছানো যায়। আমার কাছে নাইট ভিশন বাইনোকিউলার আছে।’

‘রাতে থাকতে না দিলে সেদিক দিয়ে একবার নজরদারি চালানো যেতে পারে।’ দেবমালা কিছু একটা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক গলায় বলল। কনক দত্ত আর কথা বাড়ালেন না। ধীরপায়ে এদিক-ওদিক হাঁটাহাঁটি করে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। পরি ঘোষাল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। দেবমালার প্ল্যান শুনে প্রবল উৎসাহে বললেন, ‘আমরা তাহলে শুটিং-এর ওখানে থাকব। দেবমালা যদি কপালগুণে দীননাথের রিসর্টে রাত কাটাবার সুযোগ পেয়ে যায়, তবে তো হয়েই গেল। না হলে নদীর পাড় দিয়ে যাব তিনজন।’

কনক দত্ত ব্যাগ থেকে নিজের ট্যাবলেটটা বার করে অন করলেন। তারপর গুগ্‌ল ম্যাপ খুলে পরি ঘোষালকে দেখিয়ে বললেন, ‘ব্রিজের কাছ থেকে নদী বরাবর যেতে হলে বেশ খানিকটা রাস্তা হাঁটতে হবে। অবশ্য রাস্তা বলে কিছু পাবেন না। তবে আকাশে চাঁদ পাওয়া যাবে। কিন্তু চাঁদের আলোতে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকছে।’

‘পাহারা থাকবে বলছেন?’

‘শিয়োর নই। ইন ফ্যাক্ট, ওখানে ঠিক কী হচ্ছে— সেটাও জানি না।’

‘বুদ্ধ ব্যানার্জির টিমের মিটিং হতে পারে।’

‘তাহলে পাহারা থাকবে— এটাই স্বাভাবিক।’ ট্যাবটা বন্ধ করে বললেন কনক দত্ত।

সন্ধের পরপর রিসর্টের লাগোয়া পার্কের মনোরম পরিবেশে দু’-চারজন টুরিস্ট হাওয়া খাচ্ছিল। দেবমালা একটা বেঞ্চিতে বসে কনক দত্তকে এসএমএস পাঠালেন। মিনিট দশেক পর কনক দত্ত সঙ্গে পরি ঘোষালকে নিয়ে পার্কে ঢুকে হাতছানি দিলেন দেবমালার উদ্দেশে। সে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, ‘শুটিং দেখতে যাচ্ছেন তো?’

‘যাচ্ছি বোধহয়। আপনি?’

‘সাড়ে আটটা নাগাদ বার হচ্ছি। বাই!’

দেবমালা পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় একটা পাকানো কাগজ ফেলে গেল কনক দত্তর পায়ের সামনে। পরি ঘোষাল সেটা কুড়াতে গিয়ে থেমে গেলেন কনক দত্তর ইশারায়। কয়েক মিনিট আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকার পর একসময়

হাত থেকে মোবাইলটা ফেলে দিলেন দত্ত। তারপর কাগজটার সঙ্গে সেটা তুলে নিলেন। নিজেদের ঘরে ফিরে আসার আগে কাগজটা খোলার কোনও চেষ্টাই করলেন না তিনি।

দেবমালা ইংরেজিতে কয়েক লাইন লিখেছিল সে কাগজে। ঠিক সাড়ে আটটায় সে নিজের গাড়ি নিয়ে দীননাথের রিসর্টের দিকে রওনা দেবে। তার আগে কনক দত্ত যেন পরি ঘোষালকে নিয়ে শুটিং দেখতে বেরিয়ে যায়। যদি ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, তবে দেবমালা ফোন করে জানিয়ে দেবে। নয়ত ফিরে আসবে শুটিং-এর জায়গায়। তারপর পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা।

'কী মনে হয় আপনার?' পরি ঘোষাল জানতে চাইলেন, 'দেবমালাকে অ্যালাও করবে ওখানে?'

'নদীর পাড় ধরে যাওয়াটাই মনে হয় ভাগ্যে নাচছে পরিবাবু!' বিছানার উপর পড়ে থাকা ব্যাগটা খুলতে খুলতে জবাব দিলেন কনক দত্ত, 'নিজের চোখে জায়গাটা না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি হচ্ছে না। শুক্লা দাস আমাকে চেনে। নয়ত দেবমালার সঙ্গে আমিও যেতাম রাতে থাকার জন্য।'

পরি ঘোষাল কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। কারণ বাইনোকিউলারের সঙ্গে আরও একটা জিনিস ব্যাগ থেকে বার করেছেন কনক দত্ত। একটা ঠান্ডা কুচকুচে রিভলভার।

'এটার কি প্রয়োজন হবে?' তিনি শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

কনক দত্ত হাসলেন। পরি ঘোষালের নাকের ডগায় শীতল নলটা ছুঁইয়ে দিয়ে বললেন, 'শুক্লা দাস অ্যান্ড কোম্পানি কত বড় ক্রিমিনাল, সেটা বোধহয় এখনও আপনি আন্দাজ করতে পারেননি।'

১০৫

পাঁচশো টাকা বকশিশ পাওয়ার পর থেকে দীননাথ চৌহান বেশ ফুর্তিতে আছে। রেল ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে সে নিচে নদীতে শুটিং কোম্পানির ব্যস্ততা উপভোগ করছিল। আজ সারারাত ধরে নাকি শুটিং চলবে। নায়ক-নায়িকা এখনও আসেনি। তবে নদীর দু'পাশে রীতিমতো ভিড় জমে গিয়েছে এর মধ্যেই। গ্রীষ্মের নদীতে জল প্রায় নেই বললেই চলে। ছোটবড় পাথরের মধ্যে দিয়ে সরু একটা জলের ধারা কুলকুল করে ছুটছে কেবল। আকাশে ফুটফুটে চাঁদ। সিনেমা কোম্পানি অবশ্য বড় বড় আলো লাগিয়েছে শুটিং-এর জন্য। সাধারণ পাবলিকের নদীতে নামার অনুমতি নেই এখন। শুটিং শুরু হলে ব্রিজের উপরেও নাকি দাঁড়ানো যাবে না।

'কী রে দিনা! মাল খাবি?'

একটা পরিচিত গলা পেয়ে দীননাথ ঘাড় ঘোরায়। তাদের পার্টির অঞ্চল সভাপতি মাইকেল লিম্বা দাঁত বার করে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। সুরাপানের ব্যাপারে

ঝোরা বলতে একটা সরু নালা উঁচু জমি থেকে হঠাৎ নিচে লাফিয়ে পড়েছে। বৃষ্টি হলে সে নালা বেয়ে জল নিচে পড়ে। উঁচু জমিটায় দাঁড়ালে গাছপালার ফাঁক দিয়ে রিসর্টের পিছন দিকটা দেখা যায়। জঙ্গল সেখানে খুব একটা গভীর নয়। ফরেস্ট গার্ডরা ঘোরাঘুরি করলেও লোকাল লোকদের কিছু বলে না। তবে সেখানে পৌঁছাতে হলে বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে।

দীননাথের খুব একটা আগ্রহ না থাকলেও সে একেবারে নিরামিষ নয়। সারারাত শুটিং দেখতে গেলে দু'-এক পাত্র গলায় ঢালা যেতেই পারে। কিন্তু পয়সা খরচা করে মাল খাওয়ার ব্যাপারে দীননাথের আপত্তি আছে।

'মাল খেলে চল।' মাইকেল আরও এগিয়ে আসে— 'দুটো ভুটান রামের বোতল আছে।'

দীননাথ এবার নিশ্চিন্ত হয়। পাঁচশো টাকার নোটটা অক্ষত রেখেই মাল খাওয়া যাবে জেনে স্বস্তি মাখানো গলায় বলে, 'খাবি কোথায়? এদিকে যা লোকজন। কোথাও বসলেই ভাগ চাইবে।'

'নদীর ওপারে চল।' মাইকেল প্রস্তাব দেয়, 'ওদিক থেকে হেঁটে হেঁটে ঝোরার কাছে চলে যাই। ওখানে এখন কেউ যাবে না। সব শালা শুটিং দেখবে।'

ঝোরা বলতে একটা সরু নালা উঁচু জমি থেকে হঠাৎ নিচে লাফিয়ে পড়েছে। বৃষ্টি হলে সে নালা বেয়ে জল নিচে পড়ে। উঁচু জমিটায় দাঁড়ালে গাছপালার ফাঁক দিয়ে রিসর্টের পিছন দিকটা দেখা যায়। জঙ্গল সেখানে খুব একটা গভীর নয়। ফরেস্ট গার্ডরা ঘোরাঘুরি করলেও লোকাল লোকদের কিছু বলে না। তবে সেখানে পৌঁছাতে হলে বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে।

দীননাথ চৌহান একটু ভেবে বলল, 'চল। হেভি মুনলাইটিং আছে। ড্রিঙ্কিং করলে ভাল লাগবে। কিন্তু ওয়াটার লাগবে। এমনি এমনি ভুটান দারু জমবে না।'

'পুলে ওঠার রাস্তায় চর্বির বড়া ভাজার দোকান বসেছে। তুই পয়সা দে। কয়েকটা বড়া ভাজা নিয়ে আসছি।'

দীননাথ প্রস্তাবটা মেনে নিয়ে দুটো দশ টাকার নোট বার করে দেয়। কিছুক্ষণ পর একটা প্লাস্টিকের বড় প্যাকেট হাতে নিয়ে ফিরে এসে মাইকেল জানায় যে, দুটো প্লাস্টিকের গেলাস আর একটা জলের ফাঁকা বোতলও জোগাড় করে ফেলেছে সে। জলের জন্য তো নদীটাই আছে।

ভুটান রামের বোতল দুটো নদীর ওপারে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল মাইকেল। সে দুটো বার করে নিয়ে সে হাঁটা দিল জঙ্গলের দিকে। দীননাথ তাকে অনুসরণ করল। চাঁদের আলোয় পথ চলতে বিশেষ অসুবিধে হচ্ছিল না। নদীটাকে পাশে রেখে হাঁটতে হাঁটতে একসময় শুটিং-এর হট্টগোল ক্ষীণ হয়ে গেল তাদের কানে। জঙ্গল কিছুটা গভীর হয়ে এসেছে। ওরা দু'জন চুপচাপ যতটা সম্ভব দ্রুতপায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল মাইকেল।

'হাতি নাকি?' দীননাথ থমকে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে জানতে চায়।

মাইকেল তাকে ইশারায় চুপ করতে বলে। তারপর খুব সাবধানে কয়েক পা এগিয়ে হাত তুলে নদীর দিকটা দেখায় দীননাথকে।

জমিটা উঁচু হতে শুরু করেছিল। নদীটা এখন কিছুটা নিচে। চাঁদের আলোয় জলের সরু রেখাটা রুপোলি ফিতের মতো দেখাচ্ছিল। মাইকেলের হাত অনুসরণ করে নদীর দিকে তাকিয়ে দীননাথ কিছু দেখতে পেল না।

'কী দেখাচ্ছিস বল তো?'

'আদমি।'

ফিসফিস করে বলল মাইকেল। দীননাথ অবাক হল। নদীর ওপারে বেশ খানিকটা দূরে ছায়া মাখা গাছপালার ফাঁক দিয়ে রিসর্টের আলোর আভা ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ল না তার।

'ওই পাথরটার দিকে দেখ। আদমি!'

বড় একটা পাথর প্রায় একশো মিটার দূরে নদীর এপার ঘেঁষে পড়ে আছে। জ্যোৎস্নায় সেটা চকচক করছিল। দীননাথ এবার দেখতে পেল, সেই পাথরটা ঘেঁষে দুটো ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। এবার সে উত্তেজনা দমন করে বলল, 'দেখলাম! টু পিপিল। দো আদমি ইয়ার!'

'দো নহি! তিন! ঠিকসে দেখ! থ্রি!'

হ্যাঁ। তিনটেই বটে। এবার দেখতে পেল দীননাথ চৌহান। ছায়ামূর্তির মতো তিনটে শরীর পাথরটার আড়াল থেকে বেরিয়ে নদীর বুকে নামল। তারপর জল পেরিয়ে এগতে লাগল ওপারের দিকে।

(ক্রমশ)

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই

৫০

গতকাল রাতে দশমীর ঘাটে তুমুল উচ্ছ্বাসের পর ঘুমিয়ে পড়া শহরটা এখনও সেভাবে জাগেনি। বেলা প্রায় আটটা। কদমতলা থেকে দক্ষিণে খানিকটা এগলে রেল লাইন। সেটা পেরিয়ে সোজা চলে গিয়েছে পান্ডাপাড়া গ্রামের রাস্তা। শরতের শিশিরে মাটির ভিজে ভাবটা এখনও মিলিয়ে যায়নি। রেল লাইন পেরিয়ে বীরেনের ঘোড়ার গাড়ি বেশ জোরেই ছুটছিল সুবোধ শর্মার বাড়ির দিকে। গগনেন্দ্র এদিকটায় সে দিনের পর আর আসেনি। কাঁচা পথের দু'পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাড়িঘর উঠেছে কিছু। বেশির ভাগটাই নিচু জমি। বর্ষায় ভেসে যায় বলে বাড়িগুলোর বেশির ভাগ কাঠের খুঁটির উপর বসানো। কিশোরী ঠাকুরের বাড়ির দক্ষিণে মুসলিম ঘরগুলির পর ধু ধু ফাঁকা জমি। পথের দু'পাশে বিস্তীর্ণ আকাশে উজ্জ্বল রোদ্দুরে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছিল একাদশীর সকালে। কিন্তু সে সৌন্দর্যের প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ ছিল না গগন কিংবা বীরেনের।

বাড়ির অনতিদূরে বাঁশবন ভেদ করে চলে যাওয়া পথের শেষে শর্মাদের বড় পুকুর। সুবোধ শর্মা তাঁর পাড়ে গাছের ছায়ায় মাদুর পেতে বসে ছিলেন। এলাকায় কয়েকদিন হল একজন গায়ক এসেছে। খঞ্জনি বাজিয়ে সে আগমনি গান শোনাচ্ছিল। শ্রোতা হিসেবে আরও তিন-চারজন উপস্থিত। বাড়িতে দুর্গা পুজো হয়েছে বলে ক'দিন বেশ ব্যস্ত ছিলেন সুবোধ শর্মা। আজ অবকাশ পেয়ে গানের আসর বসিয়েছেন। কোজাগরী পর্যন্ত এখন এসবই চলবে।

কয়েকটা আগমনি গান গাইবার পর শ্রোতাদের একজনের অনুরোধে গায়ক শ্যামাসংগীত ধরলেন। সুবোধ শর্মা লক্ষ করলেন, বাঁশ গাছের ফাঁক দিয়ে তিনজন ব্যক্তি এগিয়ে আসছে আসরের দিকে। তিনজনের একজন তাঁর অন্যতম ভৃত্য কিংকর। বাকি দু'জনকে সে পথ দেখিয়ে আনছিল। সেই দুই ব্যক্তিকে দেখে অবাক হলেন সুবোধ শর্মা। কিন্তু প্রখর অনুমানশক্তির কারণে মুহূর্তের মধ্যে অনুমান করে নিলেন ঘটনাটা। গায়ককে থামিয়ে বাকিদের

অনুরোধ করলেন তাঁকে একা থাকতে দেওয়ার জন্য।

'বোসো তোমরা।' জায়গাটা ফাঁকা হলে গগনেন্দ্র আর বীরেনের চোখ-মুখ একবার মেপে নিয়ে স্মিত হেসে বললেন তিনি, 'বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছ বলে তো মনে হচ্ছে না!'

গগনেন্দ্র আর বীরেন বসার আগে সুবোধ শর্মার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

'তুমি অনেকদিন পরে এলে গগনেন্দ্র! কিন্তু তুমি কে বাবা?'

প্রশ্নটা বীরেনের উদ্দেশ্যে। বীরেন তার বাবার পরিচয় দিতেই তাকে চিনতে পারলেন সুবোধ শর্মা, 'তোমায় অনেক বছর দেখিনি।' বললেন তিনি, 'আসলে এখন আর টাউনের দিকে খুব একটা যাওয়া হয় না।'

এর পর কয়েক মিনিট সবাই চুপ করে বসে থাকল। জায়গাটায় বিরাজ করতে লাগল অপরিসীম নৈঃশব্দ্য। দু'জনেই ছটফট করছিল বিষয়টা উত্থাপন করার জন্য। কিন্তু সুবোধ শর্মার মৃদু হাসি মাখানো মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে উঠতে পারছিল না যে কীভাবে কথাটা পাড়বে। সুবোধ শর্মা তাদের টানাপোড়েন উপভোগ করলেন কিছুক্ষণ। তারপর পুকুরের দিকে তাকিয়ে হাঁসের বাচ্চাদের সাঁতার কাটা দেখতে দেখতে বললেন, 'আমি বোধহয় জানি তোমরা কেন এসেছ গগনেন্দ্র! শোভা কেমন আছে?'

'ভাল। একটু জ্বর হচ্ছে আজকাল। অবনীবাবু দেখছেন।'

'আর উপেন? তার খবর কিছু পেলে?'

'আপনি এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কিছু লুকাবেন না দয়া করে!' বীরেন হঠাৎ মরিয়া হয়ে বলল, 'আমরা জানি, তার লোক আপনার আশ্রয়ে রয়েছে।'

সুবোধ শর্মা এবার হো হো করে বাচ্চা ছেলের মতো হেসে উঠে বললেন, 'জানবেই তো! উপেনের লোক ফিরে এসে আমায় বলেছিল বটে একজন তার পিছু নিয়েছে! তখন অবশ্যি বুঝিনি, সে লোক তোমরা লাগিয়েছে। টের পেলে কীভাবে? রজনীবাবু কিছু বলেছিলেন নাকি তোমাদের?'

'সে টের পেয়েছিল?' বীরেনকে ভারী অপ্রস্তুত দেখাল। তারপর খুলে বলল সব কথা।

মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনার পর সুবোধ শর্মা তারিফের সুরে বললেন, 'তোমরা তো দেখছি, লালবাজারকে হার মানিয়ে দিলে! কিন্তু সে লোক তো এখন আমার আশ্রয়ে নেই।'

'নেই?' ওদের দু'জনের হতাশা ঠিকরে বেরিয়ে এল, 'চলে গিয়েছে?'

'পচাগড় গিয়েছে সে। কোজাগরীর আগের দিন আসবে।'

'আর উপেন?'

'তার সঙ্গে কি সত্যিই দেখা করতে চাও তোমরা?' সুবোধ শর্মার গলা থেকে কৌতুকের সুরটা উবে গেল, 'সে কিন্তু আর ফিরবে না। তোমরা যদি কথা দাও যে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেবে না, তবে আমি তার সঙ্গে দেখা করার রাস্তা বলে দিতে পারি। অবশ্যি দেখা করাটা নির্ভর করবে তার ইচ্ছের উপর।'

'আপনার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে?' গগনেন্দ্রর কণ্ঠস্বরে বিস্ময় উপচে পড়ল।

'গত কয়েক মাস হল যোগাযোগ হয়েছে।' সুবোধ শর্মার গলার স্বর খাদে নেমে এল, 'তারিণী মারফত তার খবর আমি পাই। সে আমার কাছে আগেও লোক পাঠিয়ে তারিণীর দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়েছে। সে যা করতে যাচ্ছে তা খুবই বিপজ্জনক! কিন্তু তাকে আটকাবার কোনও উপায় নেই।'

'কী করতে যাচ্ছে?' বীরেন রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে, 'আমরা শুনেছি, সে বক্সার জেল ভাঙতে চায়!'

'তার আগে লাটাগুড়ি থেকে মালবাজার যাওয়ার রেল লাইন উড়িয়ে দেবে সে। ঘটনাটা হয়ত দীপাবলির রাতেই ঘটাবে। কোজাগরীর পর দ্বিতীয়ার রাতে সে আসবে দোমোহানির পুবে তিস্তার ধারে একটা জায়গায়। সেখানে তার হাতে কিছু বোমা পৌঁছে দেবে কলকাতা থেকে আসা দু'জন বিপ্লবী। তাদের কিছু টাকা দিতে হবে। পচাগড় থেকে উপেনের লোক ফিরে এসে মহেন্দ্রর বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে দিনই চলে যাবে দোমোহানি।'

জলপাইগুড়ি টাউন থেকে তিস্তা পেরিয়ে দোমোহানি যেতে সময় বেশি লাগে না। দ্বিতীয়ার রাতে সেখানে গিয়ে উপেনের সঙ্গে দেখা করা খুবই সম্ভব। সেটা বুঝতে পেরে ওরা দু'জন প্রথমে মূক হয়ে গেল। তারপর ঘোর কাটিয়ে গগনেন্দ্র উত্তেজিত সুরে বলল, 'তাকে তো খবর পাঠানো সম্ভব তবে!'

'অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু রাজি হওয়াটা তার ইচ্ছে।' বললেন সুবোধ শর্মা, 'তবে সে রাজি হল কি না, সেটা জানার কিন্তু কোনও উপায় থাকছে না। তোমরা নিশ্চয়ই দ্বিতীয়ার রাতে সেখানে যাওয়ার কথা ভাবছ?'

হ্যাঁ। সেটাই ভাবছিল দু'জন। সন্ধের পর একটা নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়লে দোমোহানির উত্তরে নদীর অপর পাড়ে পৌঁছাতে কতক্ষণই বা লাগবে? আর তাদের আসার খবর পেলে উপেন কি রাজি হবে না? বীরেনের সঙ্গে না হয় তার খাতির নেই, কিন্তু গগনেন্দ্রকে তো সে বিশ্বাস করতেই পারে! সে এখন কেবল উপেনের বন্ধু নয়, শোভার স্বামীও বটে! উপেন কি একবার তার বোনের খবর নিতে চাইবে না?

'সে অরাজি হবে না!' গগনেন্দ্র আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'আমাকে সে অবিশ্বাস করতে পারে না। সে নিশ্চয়ই দেখা করবে!'

'তোমাকে অবিশ্বাস সে করবে না গগনেন্দ্র।' সহানুভূতির সুরে বললেন সুবোধ শর্মা, 'কিন্তু তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ তার মনকে দুর্বল করে দিতে পারে।'

সুবোধ শর্মা চুপ করলেন। ওরাও মৌন হয়ে রইল। আবার শরতের চমৎকার সকালে, বাঁশবনে পাতার শব্দ জাগিয়ে তোলা হাওয়ার মধ্যে, পুকুরপাড়ে ওদের চারপাশ ঘিরে তৈরি হল থমথমে নৈঃশব্দ্য। উপেনের পথে যে পিছুটান ব্যাপারটা সযত্নে পরিত্যাজ্য, সেটা ওরা বোঝে। এই অগ্নিপথে চলতে চলতে হঠাৎ কোনও প্রিয়জনের মুখ চোখে পড়লে অন্তর আকুল হয়ে ওঠে। না। দেখা হলে উপেনকে বারেকের জন্যও ফিরে আসতে বলবে না তারা। বরং উৎসাহ দেবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। এ পথে যারা যায়, জেনে-বুঝেই যায়। তাদের ফেরানোটা শুধু অসম্ভব নয়— অধর্মও বটে।

কী আশ্চর্য! শরীরে শীত শীত ভাব নিয়ে, গায়ে চাদর জড়িয়ে শরতের রোদ্দুরে বসে থাকতে থাকতে সেই মুহূর্তে শোভার মনেও বারবার হানা দিচ্ছিল তার উপেনদার মুখ। তার সামনে পড়ে রয়েছে রবি ঠাকুরের গানের বই। একটু আগেই নেলিদি চলে গিয়েছে। সক্কাল সক্কাল এসে বাড়ির বড়দের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রণাম করে মিষ্টি খেয়ে জ্বরতপ্ত শোভাকে শুনিয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটা রবিবাবুর গান। তারই একটা গানের সুর শোভার চারপাশে মৌমাছির মতো গুনগুন করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কবিতাটা শোভা প্রথম পড়েছিল উপেনের কিনে দেওয়া রবি ঠাকুরের বইতে। তখন বাবাকে লুকিয়ে পড়তে হত রবি ঠাকুর। এখন বাবা নিজেই পড়ে। সে দিন শোভা কবিতাটা পড়ার পর উপেনকে বলেছিল, 'কীভাবে লেখে এমন?'

জবাবে উপেন বলেছিল, 'তা জানি না। তবে জানতে পারলে মেসোমশাই কীভাবে পিঠে কাশের গুচ্ছ আছড়াবে, সেটা বলতে পারি।'

শোভা হি হি করে হেসে উঠেছিল শুনে। এখন সেটা মনে পড়ায় ঠোঁটের ভাঁজে মুচকি হাসি খেলে গেল তার। জ্বরের আলস্য ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল শারদালোকে হাত বাড়িয়ে সে আপন মনে গুনগুন করে গাইতে লাগল, 'গেঁথেছি শেফালি মালা/ নবীন ধানের অঞ্জলি দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা—।'

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

বিপিনবাবুর বারণসুধা

রাজুর তিনফুটি ব্যাগের তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। স্টুডিয়োর বাইরে থাকা প্রোডিউসারের বন্ধুর জুতো কি গেল জল আনতে? রামোজি ফিল্ম সিটিতে গিয়ে জল হয়ে যায় গঙ্গার— কিন্তু একটাই সংকট! সামনেই রিলিজ 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'র। ফিল্মের ক্যানে যদি ছিটিয়ে দিতে হয় হোলি ওয়াটার, তবে? এবারের পর্বে রাজুই নায়ক। রাজুর গপ্পেই কিস্তিমাত করে দিয়েছেন লেখক। আসলে জুতো বদল কিংবা ফিল্ম সিটির বাস অথবা তিন ভাগ জল— সবটাই একসূত্রে গাঁথা কিনা!

পাপোশের পাশে রাখা ছিল শু-জোড়া। সেটা পায়ে গলাতে গিয়ে বিদায়ী অতিথি হঠাৎ আর্ত চিৎকার করে উঠলেন, এ কী! এটা তো আমার জুতো নয়! আমারটা গেল কোথায়?

দরজার ভিতর-বাইরে মিলিয়ে অকুস্থলে তখন জনা চারেক মানুষের সমাবেশ। মুহূর্তে তারা সবাই সচকিত সে চিৎকার শুনে। অবাক কাণ্ড তো! এই দরজা রাস্তার ধারে নায়। বাড়ির রীতিমতো ভিতরে, দোতলায় ওঠার সিঁড়িটির মুখে। সেখানে এমন রহস্যজনকভাবে জুতো কী করে বদলে গেল? তদুপরি, ব্যাপারটা এমনও নয়, যে ভাল জুতো লোপাট করে কেউ ছেঁড়া চপ্পল রেখে গিয়েছে। এ তো মোটামুটি ভদ্রস্থ ধরনেরই শু দেখা যাচ্ছে। উপস্থিত সবাই রীতিমতো বিভ্রান্ত। যার প্রমাণ, এই দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ নিয়ে তাদের এলোমেলো আলাপচারিতা। যদিও আমি কিন্তু ততক্ষণে ওই জুতোটা চিনতে পেরে গিয়েছি। অনুচ্চস্বরে তাই বিড়বিড় করে বললাম, হতচ্ছাড়া রাজু! একেবারে কিং অব গ্রেট গোলমাল!

কলকাতায় ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে এই জায়গাটার নাম মেট্রোপলিটান। আর স্টুডিয়োটি হল প্রেস্টো রেকর্ডিং স্টুডিয়ো। মেঘলা দিনে, আজ সকাল থেকে সেখানে আমাদের বিজ্ঞাপনী জিঙ্গল তৈরির কাজ চলছিল। মিউজিক ট্র্যাক এবং ভয়েস, দুটোরই রেকর্ডিং শেষ হয়ে গিয়েছে সন্ধে সাতটা নাগাদ। এবার বাকি শুধু মিক্সিং। এর মধ্যে হঠাৎ প্রোডিউসার এবং তাঁর এক বন্ধু অঘোষিতভাবে এসে হাজির হলেন, সরেজমিনে কাজের অগ্রগতি দেখবেন বলে। এমনিতে কাজের অগ্রগতি নিয়ে এক ফোঁটাও সমস্যা ছিল না। প্রোডিউসার সবকিছু দেখে-শুনে যথেষ্টই খুশি। কিন্তু তাঁর আগমনটি অঘোষিত বলেই বিপত্তি। গাড়ির আওয়াজ শোনামাত্রই রাজুকে এক লম্বা লাফ দিয়ে তড়িৎ গতিতে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। যেন কোনও পুরনো পাওনাদার এসে হানা দিয়েছে! এই অতি তৎপরতার পিছনের ইতিহাসটি এখানে বলে নেওয়া দরকার। দুপুরের পর থেকেই শুরু হয়েছিল ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, যার প্রভাবে একটা অন্য রকমের উচাটন ভাব আমাদের টিমের অনেককেই আন্দোলিত করছিল। তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হল রাজু, এইসব পরিস্থিতিতে যে কিনা রক্তের স্বাদ-পাওয়া বাঘ। রাত যত বাড়বে, আবহাওয়া আরও খারাপ হবে, সন্ধের মুখে এইরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল সে। তারপর আমাদের জন্য টিফিন আনতে যখন বেরয়, একদম বিলম্ব না করে সে সবার আগে কারণসুধার পোক্ত

ব্যবস্থা করে ফেলে। খারাপ ওয়েদারে পরে যদি পথে জল জমে বা মদের দোকান বন্ধ হয়ে যায়, কে রিস্ক নেবে?

এইসব আয়োজনে রাজু কখনও ত্রুটি রাখে না। বছরকয়েক আগে অফিসের একটি বিনোদনমূলক ট্রিপ হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। রাজু তখন তার তিন ফুট হাইটের ঢাউস ব্যাগখানা এমনভাবে বোতলে ঠেসেছিল, যে তার ফলে আমাদের পৃথিবীর মতো ওর ব্যাগটিও হয়ে পড়েছিল তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল! রেল স্টেশনের ওভারব্রিজ থেকে বাসের ছাদ... সবখানে ওই বহুমূল্য ব্যাগটি পালাক্রমে বহন করতে করতে দলের সবার শিরদাঁড়া বেঁকে ধনুক। অথচ এত ঝঞ্ঝাটের পর গন্তব্যে পৌঁছে দেখা গেল, সেখানের দোকানে সবরকম ব্যান্ড দিব্যি বিক্রি হচ্ছে। ব্যাস! সবাই জাস্ট একযোগে রেগে ফেটে পড়ল রাজুর উপর। বেকার বেকার এমন কুলিগিরি করানোর কোনও মানে হয়?

কিন্তু রাজু নির্বিকার। গালাগালির অঝোর বৃষ্টির মধ্যেও সে শান্ত স্বরে বলল, কষ্ট না করলে কেউ কেষ্ট পায় না। এটুকু জেনে রাখো, যে মদের পিছনে যত কষ্ট, তার টেস্টও তত যথেষ্ট!

ফিরে আসি স্টুডিয়োর কীর্তিকলাপে। একটু রিওয়াইন্ড করতে হবে। প্রোডিউসার সাহেবের সারপ্রাইজ ভিজিটের আধ ঘণ্টা আগের কথা। আমরা সবাই চা-জলখাবার খাচ্ছি। এদিকে রাজু তার মধ্যে তাচ্ছিল্যের স্বরে ঘোষণা করল, সূর্যাস্তের পরে চা... একেবারেই না! তারপর ভাল করে গেলাস ধুয়ে এনে, সাড়ম্বরে বোতলের শুভ উদ্বোধন করে ফেলল, একা একাই। সবাইকে 'চিয়ার্স!' জানাবার সময় সে এক অবর্ণনীয় উজ্জ্বল হাসি তার মুখে! প্রোডিউসার যতক্ষণে এসে উপস্থিত হলেন, তার মধ্যে রাজুর বার চারেক 'চিয়ার্স!' বলা হয়ে গিয়েছে! এবং, প্রতিবারই গলার শব্দ আগের চেয়ে কয়েক ডেসিবেল উপরে চড়ছিল। সুতরাং, সে অবস্থায় প্রোডিউসারের সামনে স্বাভাবিক আচরণ করার আত্মবিশ্বাসে যথেষ্ট ঘাটতি থাকায়, সে তুরন্ত উধাও স্টুডিয়োর পিছন দিকে, নির্মীয়মাণ ভবনের ইটকাঠের খাঁচার অন্ধকারে। 'প্লিজ, তোরা একটু ম্যানেজ করে নিস।...' পলায়নের আগে তার সকাতর অনুরোধ!

ভাগ্যিস জলখাবারটা ততক্ষণে উধাও হয়ে গিয়েছিল আমাদের উদরে। তাই প্রোডিউসার যখন জানতে চাইলেন, রাজু কোথায়... জবাবে আমি অম্লানবদনে বললাম, এই তো টিফিন আনতে বেরল...

সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল তারপর। কিন্তু, প্রোডিউসার পরিদর্শন সেরে খুশি মনে বেরিয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে, আচম্বিত পাদুকা কেলেঙ্কারি! প্রোডিউসারের বন্ধুটি জুতো হারিয়ে কাঁচুমাচু। আর প্রোডিউসার রেগে প্রায় অগ্নিশর্মা!

যে দরজার সামনে আমাদের বর্তমান জটলাটি চলছে, তার বিপরীতে কয়েক পা দূরেই আরেকটা টিনের দরজা রয়েছে। খানিক আগে যে পথে রাজু আলোর গতিতে ছুটে পালিয়েছিল। জুতো রহস্যের সমাধান যে ওই দরজাটির আড়ালে, আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত। কিন্তু সর্বসমক্ষে তো তদন্ত চালানো সম্ভব নয়। তাই গলাখাঁকারি দিয়ে প্রোডিউসার সাহেবকে বললাম, আপনারা প্লিজ একটু ভিতরে বসুন। চায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। ততক্ষণে আমি জুতোর ব্যাপারটা দেখছি। কোথায় আর যাবে? নিশ্চয় কেউ ভুল করে সরিয়ে রেখেছে।

টিমের বাকিদের উদ্দেশে আমি চোখের ইঙ্গিত করলাম। ওরা ধাঁধাটা পুরো বুঝতে না পারলেও, আমার ইশারা বুঝে নিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন, ভিতরে আসুন... এই পান্টু, শিগগিরি চা নিয়ে এসো... সবাই ব্যস্তভাবে শোরগোল জুড়ে দিল। প্রোডিউসার এবং তার বন্ধু নিমেষের মধ্যে চালান হয়ে গেলেন স্টুডিয়োর ভিতরে।

ক্যাঁচ্‌চ্‌চ্‌...। টিনের দরজা খুলে আমি পা রাখলাম অন্ধকার অঞ্চলটির ভিতরে। দাঁত বার করা ইটের দেয়াল এবং লম্বা লম্বা গোটাকয়েক সিমেন্টের পিলার আমায় স্বাগত জানাল। চাঁদের আলোতে বেশ ভূতুড়ে একটা পরিবেশ। আমি ফিসফিস করে ডাকলাম... রাজু! এই রাজু!

কোনও সাড়াশব্দ নেই। এবারে আরেকটু জোরে ডাকলাম, এই হারামজাদা রাজু! গাঢ় ছায়াচ্ছন্ন এক পিলারের পিছন থেকে একটি মুণ্ডু উঁকি দিল। তারপর, টান মারলে যেভাবে কাগজের গায়ে সেঁটে থাকা সেলোফেন খুলে আসে, ঠিক সেভাবেই এই মুণ্ডুর পিছুপিছু আস্ত একটা শরীর ছায়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এল চাঁদের আলোয়। মূর্তিমান রাজু। আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে সে খুব খুশি খুশি স্বরে বলল, দেখলি, কেমন বুদ্ধি করে আমার জুতোটা তুলে নিয়ে এসেছি। হেঁ হেঁ, নয়তো উনি ঠিক বুঝে যেতেন, আমি এখানেই আছি! জুতো না পরে কেউ টিফিন আনতে যেতে পারে? আমি ওর দেঁতো হাসির জবাবে রাগে গরগর করে উঠে বললাম, ন্যাকামো! উনি জুতো সরাতে গিয়েছেন! প্রোডিউসার সাহেব কোন দুঃখে তোর জুতোটা চিনে রাখতে যাবে বল তো? এ কি রামচন্দ্রের পাদুকা?

রাজু একটু থতমত খেল সে কথা শুনে। তারপর আমতা আমতা করে বলল, আমি ভাবলাম, বাই চান্স যদি চিনে ফেলে... তাই রিস্ক নিলাম না।

—তুই নিজে চিনিস, তোর নিজের জুতো?

আমি এবারে মোক্ষম প্রশ্নটি করলাম। রাজু একটু ঘাবড়ে গেল আমার মারমুখী ভাব দেখে। তারপর চোখ পিটপিট করে বলল, রোজ যে জুতো পরছি, সেটা চিনব না? এই তো... হাত বাড়িয়ে ইটের পাঁজার আড়াল থেকে সে একজোড়া জুতো বার করল। তারপর চাঁদের আলোয় সেটাকে দেখে ভারী অবাক হয়ে বলল, যাঃ তেরিকা! আমার জুতো আবার এমন দেখতে হয়ে গেল কবে থেকে?

এই হল শ্রীমান রাজু। আমাদের প্রোডাকশনে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা যার হাতে। স্টুডিয়ো, ইকুইপমেন্ট, আর্টিস্ট, ট্রাভেল, টেকনিশিয়ান, হোটেল... কী নেই সেই লিস্টে। আর দিনের শেষে, সব ঝঞ্ঝাট সামলে একটু রিল্যাক্স করার জন্য যে জলীয় বন্দোবস্ত দরকার, তার বেলায় আবার সব চেয়ে বেশি দায়িত্বশীল। মানে, অন্য কাউকে সেই ব্যাপারে কোনও মাথাব্যথা কিছুতেই নিতে দেবে না। এবং সেই সূত্রে মাঝেমধ্যে ঘটাবে এমন কিছু উদ্ভট গোলযোগ, যার তুলনা চট করে খুঁজে পাওয়া মুশকিল!

একবার রামোজি ফিল্ম সিটিতে প্রায় এক সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল পোস্ট প্রোডাকশনের কাজে। পাথুরে পাহাড় আর ধু ধু প্রান্তরের মধ্যে সে যেন এক নির্বাসনের আখড়া। প্রথম দিন পৌঁছে হালচাল দেখে রাজু চিন্তিতভাবে বলল, সন্ধের পর তো এখানে খুব বেকায়দায় পড়তে হবে। তোরা বরং স্টুডিয়োতে গিয়ে কাজ কর। আমি ততক্ষণ দেখি, একটু সিটি ঘুরে বন্দোবস্ত করে আসি।

সিটি মানে হায়দরাবাদ, যা রামোজি ফিল্ম সিটি থেকে গাড়িতে ঝাড়া এক ঘণ্টার পথ। আমাদের নিজেদের কোনও গাড়ি নেই। ফলে ফিল্ম সিটির গেটের বাইরে গিয়ে ওকে কিছু একটা বাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। মন্দির, প্রাসাদ, এয়ারপোর্ট, বাজার মহল্লা ইত্যাদি পেল্লায় সব সেট পেরিয়ে ওই গেট অবধিও দূরত্ব ভরপুর দু-তিন কিলোমিটার। আর ভরদুপুরে সে অঞ্চলে তখন পালে পালে হনুমান টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। অকুতোভয় রাজুর কাছে অবশ্য ওইসব প্রতিবন্ধকতা নস্যি। ওর একটা মস্ত সুবিধা হল, ছোটবেলায় বেশ কিছুদিন চেন্নাইয়ে ছিল বলে দক্ষিণের ভাষাটা ভালই রপ্ত আছে। সেটার জোরে ফিল্ম সিটির এক টুরিস্ট বাস ড্রাইভারকে ঠিক কবজা করে ফেলল। ছাদ খোলা ওই বাহারি বাস খালি অবস্থায় ফিল্ম সিটির গেটে যাচ্ছিল টুরিস্ট তুলে আনতে। রাজু তার সিটে দিব্যি ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে বসে রওনা হয়ে গেল তার মহৎ অভিযানে।

রাজুর গল্পে শুরুটা সবসময় এমন রাজকীয় হয়। কিন্তু ওর ভাগ্য হল, পৃথিবীর

ইতিহাসের সেইসব অসংখ্য সিনেমার মতো, যেগুলো হাফ টাইমের আগে অবধি দারুণ টানটান হলেও, সেকেন্ড হাফে ঠিক গোঁত্তা খেয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রেও প্রায় সেটাই হতে যাচ্ছিল। দরকারি জিনিসপত্রের স্টক ঠিকঠাকমতো সংগ্রহ করে রাজু ঘণ্টা তিনেক পর নির্বিঘ্নেই আবার অটো ধরে ফিরে এল ফিল্ম সিটির গেটে। কিন্তু সে জানত না যে গেটের ভিতরে অটো নট অ্যালাউড। রামোজির নাম লেখা পেল্লায় সিংহদরজার সামনে ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল অটোখানা। বড়সড়ো একখানা পোঁটলা হাতে সেখানে দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামছে রাজু। আর ভাবছে, এবার কী করা যায়?

ভাগ্যক্রমে, ওর সামনে তখন সফর শেষ করে এসে দাঁড়াল সেই চেনা টুরিস্ট বাসটাই। ফিল্ম সিটির ভিতরে হরেক দ্রষ্টব্য দেখে আসা টুরিস্টরা বেশ খোশমেজাজে দল বেঁধে বাস থেকে নামছে। রাজু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন বাস খালি হয়। এদিকে ততক্ষণে আরেকটি গাড়িতে সেখানে এসে হাজির হয়েছেন এই ফিল্ম সিটির প্রতিষ্ঠাতা, স্বয়ং রামোজি রাও। মাঝে মাঝেই নাকি তিনি এরকম সরাসরি জনসংযোগ করতে আসেন। মানুষের কেমন লাগছে এই ফিল্ম সিটি, সেটা তাদের মুখ থেকেই শুনতে চান।

সেটা সেল্‌ফির যুগ ছিল না। টুরিস্টরা সবাই ভিড় করে রামোজির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। কেউ কেউ অটোগ্রাফ দিচ্ছে। সেই ফাঁকে রাজু গুটিগুটি পায়ে গিয়ে বাসে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু বাদ সাধল ফিল্ম সিটির কিছু কর্মী, যারা আগে থেকেই ওই বাসে উঠে বসে আছে। গেটের ডিউটি খতম হলে তারা রোজ এই বাস ধরে ফিল্ম সিটির ভিতরে ফেরে। বেআইনিভাবে কোনও বহিরাগতকে তারা কিছুতেই বাসে উঠতে দেবে না। ব্যাস! ঝামেলা লেগে গেল। অল্পবিস্তর বিয়ার খেয়ে এসেছিল বোধহয় রাজু। হিন্দি, ইংরেজি এবং তামিলে সে তর্কের তুলকালাম তুফান বইয়ে দিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা! রাজুকে পুরো অগ্রাহ্য করে, কর্মীদের নির্দেশে ড্রাইভার বাসটি নিয়ে ধীরে ধীরে বাঁক ঘোরা আরম্ভ করল। লম্বু রাজু তার জানালার পাশে তিড়িংবিড়িং করে বিস্তর লাফিয়ে ঝাঁপিয়েও দেখল, মোটেই সুবিধা হচ্ছে না। অগত্যা অ্যাবাউট টার্ন নিয়ে সে তিরবেগে ছুটে গেল সটান রামোজি রাওয়ের কাছে। ভদ্রলোক হাসি-হাসিমুখে সবে আরেকটি অটোগ্রাফ দিতে যাচ্ছিলেন... এক ঝটকায় সেই হাত টেনে ধরল রাজু! তারপর শার্টের হাতা ধরে প্রায় ঝুলে পড়ে বলল, স্যার, প্লিজ স্টপ দ্যাট বাস! আপনি একটু বলে দিন। ওরা আমাকে সামান্য একটু লিফ্‌ট দিতে আপত্তি করছে! বেঙ্গল থেকে এখানে এত দূরে কাজ করতে এসেছি স্যার। কিন্তু এরকম ব্যবহার পেলে কেউ আর আসবে, আপনি বলুন? জবাবে রামোজি বললেন, উঃ!

কারণ রাজুর হাতের বিরাট পোঁটলাখানা সরাসরি তার হাঁটুতে একটি ঠোকা মেরেছে। একাধিক বোতলের সম্মিলিত সে গুঁতোর ওজন বেশ কয়েক লিটার, যার প্রভাবে ভদ্রলোক নিচু হয়ে হাঁটু মালিশ করতে বাধ্য হলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সহচরদের নির্দেশও দিলেন বাসটি ফিরিয়ে আনার জন্য। তারপর চোখ বোলালেন একবার রাজুর দিকে, একবার পোঁটলাটির দিকে। তাঁর সপ্রশ্ন দৃষ্টির সামনে রাজু একটু যে নার্ভাস হয়নি তা নয়। কিন্তু মদের দেবতা পলকের মধ্যে প্রশ্নের জবাব জুগিয়ে দিলেন তার মুখে। একগাল হেসে অতি সপ্রতিভভাবে সে বলল, অনলি ওয়াটার স্যার... হোলি গঙ্গা ওয়াটার। ডাইরেক্ট ফ্রম কলকাতা। উই নিড প্লেনটি, ইউ নো... টু মেক বেঙ্গলি সিনেমা হিট! ইচ ফিল্ম ক্যান... উই মাস্ট ডিপ... লিট্‌ল লিট্‌ল!

হাঁটুতে টনটনানি সত্ত্বেও রামোজি ব্যাপারটি শুনে খুবই খুশি হলেন। দক্ষিণ ভারতে সিনেমার বিষয়ে এরকম প্রচুর সংস্কার মানা হয় কিনা। মুখে উজ্জ্বল হাসি নিয়ে তিনি মাথা নেড়ে বললেন, গুড! ইট'স আ ভেরি গুড প্র্যাকটিস।

বাসটা ততক্ষণে আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের সামনে। রাজু চটপট সেটার পাদানিতে উঠে পড়ে একদম জাপানি কায়দায় বারে বারে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে থ্যাংকস জানাল রামোজিকে। এবং হেসে হেসে বলল, গুডবাই।

কিন্তু মুখে হাসি থাকলেও, ভিতরটা তার যথেষ্ট শুকিয়ে ছিল। পরে ফিরে এসে আমাদের বলেছিল, বাসটা না ছাড়া অবধি আমার তখন কী টেনশন হচ্ছিল জানিস?

—ধ্যাৎ! তোর আবার টেনশন আসবে কোত্থেকে? আমি প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, 'আসার আগেই তো সেটা বিয়ারের জলে ভেসে যাওয়ার কথা।'

—না রে। বারে বারে খালি একটাই কথা মনে হচ্ছিল...

—কী কথা?

—সামনেই তো এদেরও বাংলা ছবির রিলিজ আছে... বোম্বাইয়ের বোম্বেটে...

—তো কী হয়েছে?

—মনে হচ্ছিল, এই বুঝি রামোজি বলে বসে... আমার জন্যেও একটু হোলি ওয়াটার রেখে যাও তো! আমিও ফিল্ম ক্যানে ছিটিয়ে নেব!

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের আষাঢ় মানে
‘ডি-ইলিশিয়াস’

দিনবাজারে মাছের বাজারে ঢুকতে বাঁ দিকে পরপর তিন ভাইয়ের দোকান। কৃষ্ণমুরারি, অশোক, শিবু। আমরা ওই তিন দোকানির বংশানুক্রমিক খদ্দের। সে দিন গিয়েছিলাম মাছ কিনতে। থরে থরে ইলিশ এসেছে বাজারে। সাতশো-আটশো গ্রাম ওজনের মাছের দর হাজার টাকা কিলো। এক কেজি ওজনের মাছও আছে। দুর্বল হৃৎপিণ্ডের রুগির তার দাম শোনা বারণ।

আমার পাশে মাঝবয়সি এক মাতব্বর গোছের লোক দরদাম করছিল। সবজান্তার মতো করে বলছিল, ইলিশ কী এমন মাছ, যে তার এত দাম! গায়ে রুপোলি আঁশ না থাকলে এই মাছ নিয়ে এত মাতামাতি হত কি না সন্দেহ। তারপর পানের পিক ফেলে দাম জিজ্ঞেস করেছিল ইলিশের। শিবুদা গেরামভারী গলায় বলল, ওই মাছ বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আপনি অন্য মাছ দেখুন। কাতল, চারাপোনা, পুঁটি, গোলসা, ট্যাংরা আছে। সেসব নিন। লোকটা হাঁ হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, সব ইলিশ বিক্রি হয়ে গিয়েছে? বিয়েবাড়ির ভোজ আছে নাকি আজ? শিবুদা ছালার নীচ থেকে নোটের তাড়া বার করে টাকা গোনায় মন দিল। লোকটার কথা যেন কানেই যায়নি তার।

সাতসকালে এত দামি ইলিশ সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে শুনে তাজ্জব হলাম। গুটিগুটি চলে আসতে যাব, ইশারায় শিবুদা দাঁড়াতে বলল আমাকে। ওই মাঝবয়সি ক্যাপটেন গোছের খদ্দের কিলোটাক রুই থলেতে ভরে চলে যাবার পর শিবুদা একটা ইলিশ তুলে নিয়ে বাটখারায় চাপাল। আমাকে অবাক হতে দেখে শিবুদা বলল, ওকে মিথ্যে কথা বলেছি। আমি বললাম, কেন? লোকটা কি বাকিতে মাছ নেবে? উত্তরে শিবুদা মুখ বাঁকিয়ে বলল, যে লোক আঁশ দেখে ইলিশ মাছের জাতগুণ বিচার করে, তাকে আমি মরে গেলেও মাছ বিক্রি করব না। লাখ টাকা দিলেও না! বেশ একটা ‘লোকশিক্ষে’ হল। ইলিশ মাছের মতো ইলিশ মাছের ব্যাপারীরাও যে এমন মেজাজি হয়, সেটা জানা হল!

ইলিশ মাছ দিয়ে যখন এই লেখা শুরু হয়েছে, তখন একটা কথা জিজ্ঞেস করি। রবীন্দ্রনাথের ‘যোগাযোগ’ উপন্যাস কীভাবে শুরু হয়েছিল মনে আছে? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।— ‘আজ সাতই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন। ভোর থেকে টেলিগ্রাফ ও ফুলের তোড়া আসছে।’— এভাবেই শুরু হয়েছিল সেই বিখ্যাত উপন্যাস। কিন্তু এতদিন পর সেই উপন্যাস নতুন করে পড়তে বসলে মনে হয়, যখন বর্ষার মেঘ দলবল, সঙ্গীসাথি নিয়ে ঢুকে পড়েছে ডুয়ার্সে, যখন আমাদের পাতে পাতে এসে পৌঁছাচ্ছে ডিলিশিয়াস ইলিশ— রবীন্দ্রনাথ কি পারতেন না অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিনে একজোড়া ইলিশ পাঠাতে?

আমাদের দোষ নেই। বাঙালি যে কোনও সাধারণ পাঠকের মনের মধ্যে এই প্রশ্নের গুঞ্জরন তো হবেই। কেননা জীবনানন্দ থেকে সুনীল, শক্তি থেকে শঙ্খ হয়ে জয়— প্রত্যেকেরই তো ‘মেন্টর’ হল গিয়ে এই মাছ। বুদ্ধদেব বসু তো ভালবেসে নামই দিয়েছিলেন ‘রূপালি শস্য’। এ এমনই এক মাছ, যাকে নিয়ে গল্পকথার শেষ নেই। তবে রোমান্টিকতায় ঢোকার আগে ‘হার্ডকোর’ একটা তথ্য দিয়ে রাখা ভাল। ইতিহাসের অন্যতম বর্ণময় চরিত্র সম্রাট মহম্মদ বিন তুঘলককে মনে আছে তো? তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন গোটাকতক আস্ত ইলিশ মাছ খেয়ে ফেলে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যাঁকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ নামে জানি, তাঁর শেষ খাদ্যতালিকায় ছিল— আজ্ঞে হ্যাঁ, এই ইলিশ মাছ।

এই সেই মাছ, যাকে জীবিত অবস্থায় কেউ কখনও দেখেনি। কিন্তু মৃত্যুর পরই কী তার সোয়াদ! দেবভোগ্য বলা চলে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘স্মৃতির শহর’ কাব্যগ্রন্থের এক কবিতায় কি সাধে লিখেছিলেন— ‘সস্তায় পেলেন তাই/ যমজ ইলিশ নিয়ে বাবা বাড়ি ফিরলেন/ রাত্তির ন’টায়/ বাবা বাড়ি ফিরলেন রাত্তির ন’টায়’।

আসলে তখন বাগবাজার ঘাটের কাছে সন্ধেবেলা ইলিশ উঠত। সে ইলিশের স্বাদ নাকি সবচেয়ে ভাল। সুনীল বলতেন, ‘নোনতা মাছ যত মিষ্টি জলে ঢুকবে, তার টেস্ট তত বাড়বে। তোমাদের সময় তো লঞ্চ-টঞ্চ চলে তাই সেই ইলিশ পাবে কোথায়!’ অবশ্য এটাও ঠিক যে, কোনও দিনই তাঁর খাবারের সম্বন্ধে তেমন একটা আকুতি ছিল না।

শোনা যায়, নানা দেশে নাকি ইলিশ বা ইলিশের মতো মাছ পাওয়া যায়। সাহেবদের ‘স্যামন’ নাকি আমাদেরই ইলিশ। এটা কি বিশ্বাস করা যায়? মায়ানমারের ইরাবতী নদীর ইলিশ, হলদিয়ার হলদি নদীর ইলিশ, রূপনারায়ণের কোলাঘাটের ইলিশ আর বাগবাজার বা শ্রীরামপুরের ইলিশ— সব আসলে এক। একেই বোধহয় বলে— একই দেহে রামনাম কৃষ্ণ সমধুর!

ইলিশের বিভিন্নরকম প্রিপারেশন হতে পারে। লম্বা লম্বা বেগুনের সঙ্গে নধর সাইজের ইলিশ হালকা ভেজে সরষের তেলে কালোজিরে, কাঁচালংকা চিরে সোনালি রঙের ঝোলে রাঙাতে পারে কেউ। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বাণী একটু নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়ে গুনগুন করাই যেতে পারে— ‘রাঙিয়ে দিয়ে যাও, যাও গো এবার খাবার আগে, রাঙিয়ে দিয়ে যাও।’ কেউ বড় ডেকচিতে গরম জল ফুটিয়ে তার মধ্যে ঢাকা দেওয়া বাটিতে হলুদ-নুন-লংকা মাখিয়ে ইলিশকে বসিয়ে রাঁধতে পারে। এটা সেই ডিশ, যাকে একটু বাদেই ‘ভাপা ইলিশ’ বলে ডাকা হবে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ইলিশ পাতুরিও কিন্তু জগদ্‌বিখ্যাত। কলাপাতা দিয়ে মোড়া সে জিনিস যেন এক-একটা হীরের টুকরো।

ইলিশকে আরও বেশি বিখ্যাত করার

জন্য এখন কলকাতার পার্ক স্ট্রিট থেকে শরৎ বোস রোড পর্যন্ত নামীদামি রেস্তরাঁগুলো শুরু করেছে কাঁটাবিহীন ইলিশের ডেলিকেসি। ‘বোনলেস’। গোলাপের গন্ধ শুঁকব, কিন্তু কাঁটা আঙুলে লাগবে না। আমাদের ডুয়ার্সেও কয়েক জায়গায় শুরু হয়েছে ইলিশ উৎসব। যা গতিপ্রকৃতি দেখা যাচ্ছে, তাতে এই ট্রেন্ড ক্রমশ জমে উঠবে বলেই অনুমান।

ইলিশ নিয়েই যখন কথা হচ্ছে, তখন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘মঙ্গলগ্রহ’ গল্পটির কথা মনে না পড়ে যায় না। মীনবংশ যৌনতার প্রতীক। স্ফটিকের মতো লাল চোখ, ওই রুপোলি শরীর খণ্ডিত হলে যে রক্ত ঝলসে ওঠে, তার যৌন ইশারা কীভাবে আমাদের তছনছ করে দেয় তা জ্যোতিরিন্দ্র দেখিয়েছেন সেই আশ্চর্য গল্পে।

কুলদা এক নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানি। তার জীবনে আচমকা এক মঙ্গল গ্রহ এসে ঢুকে পড়ে। তার সংসার বাতে শয্যাশায়ী; স্ত্রী হেম, দুই মেয়ে প্রীতি ও বীথি, দুই ছেলে মন্টু ও ফন্টুকে নিয়ে। মেয়েরা বড় হয়েছে, কিন্তু কুলদা বিয়ে দিতে পারেনি এখনও। তাই প্রীতি দিনে দিনে খিটখিটে হয়েছে। যে বাড়িতে কুলদা ভাড়া থাকে, তার ইট-পলেস্তারা খসে পড়েছে। সিঁড়িটা কাঁপে। ছাদ দিয়ে জল পড়ে। ইলেকট্রিক নেই। মোমবাতি বা রেড়ির তেলে কাজ সারতে হয়। এহেন বাড়ির একটি অংশে কলকাতায় বেড়াতে এসে ভাড়াটে হয়ে ওঠে লীলাময়ী ও তার ইঞ্জিনিয়ার স্বামী। প্যাসেজের ওপারে তাদের ঘর লাল আলোয় ভরা। যেন দূরের মঙ্গল গ্রহ। লীলাময়ী কেমন? থমথমে যৌবন, বিশাল বিকশিত খোঁপা। কুলদা নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকে দূর থেকে দেখে।

সকালে ঘুম ভেঙে ওঠা লীলাময়ীকে দেখে কুলদা— ‘শুকনো খোঁপার আধখানা মুখ থুবড়ে ঘাড়ের উপর পড়েছে। ভাঙাচোরা আঁচলের ঢেউ। শরতের কাঁচা রোদ গালে কানে পিঠে লেগেছে।’ ট্রামের ভিড়ে, অফিসের লেজারের সামনে বসেও কুলদা ছবিটা দেখতে পায়। ‘খোঁপার চওড়া কালো-পাড় আঁচল উঠেছে। জোড়া ভুরু ধনুকের মতো বাঁকা। তনু মধ্যম গড়ন। জীবনে এই আমি প্রথম দেখলাম পরিপূর্ণ যৌবন।’

লীলাময়ীর স্বামী কলকাতায় বেড়াতে এসে ঘরে প্রায় থাকেই না। সে দিন বিকেলে কুলদা অফিস থেকে ফিরলে লীলাময়ী তাকে বাজার থেকে একটু মাংস এনে দিতে বলে। বেশ কচি পাঁঠার মাংস। কুলদা উত্তেজনায় বাজারের দিকে দৌড়ায়। মাংস নিয়ে আসার পরের ছবিটা জ্যোতিরিন্দ্র আঁকছেন— ‘অপরূপ দীর্ঘ দেহ। ঘন চকচকে ছোপ দেওয়া শাড়ি পরনে। মনে হল মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে নিঃশব্দচারিণী কোনও বাঘিনি। মাংসের পুঁটুলিটা হাতে করে চৌকাঠের ওপারে পার্টিশনের আড়ালে অদৃশ্য হল। সুন্দর, গর্বিত, নির্ভীক।’

পরদিন সকালে আবার লীলাময়ী আসে কুলদার কাছে। এবার তার ফরমাশ, অফিস থেকে ফেরার পথে গঙ্গার ইলিশ এনে দিতে হবে। কুলদা আরও উত্তেজিত। বিকেল পাঁচটা বাজতেই কুলদা গঙ্গার ঘাটে যায়, ‘সতেরোটা মাছ উলটে পালটে দেখে শেষে বেশ চকচকে চ্যাপ্টা মনের মতো ইলিশ বেছে নিয়ে দাম চুকিয়ে এসে বাড়ির দিকে এগয়।’

> ইলিশের বিভিন্নরকম প্রিপারেশন হতে পারে। লম্বা লম্বা বেগুনের সঙ্গে নধর সাইজের ইলিশ হালকা ভেজে সরষের তেলে কালোজিরে, কাঁচালংকা চিরে সোনালি রঙের ঝোলে রাঙাতে পারে কেউ। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বাণী একটু নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়ে গুনগুন করাই যেতে পারে— ‘রাঙিয়ে দিয়ে যাও, যাও গো এবার খাবার আগে, রাঙিয়ে দিয়ে যাও।’

তার ছেলেমেয়েরা দেখে, বাবার হাতে একটা ইলিশ ঝকমক করছে। কিন্তু সব দৃষ্টি উপেক্ষা করে তার মঙ্গল গ্রহের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ে। আলো জ্বলে ওঠে। বেরিয়ে আসে লীলাময়ী, ‘ফোলা-ফোলা চোখ। যেন অবেলায় অনেক ঘুমিয়ে উঠেছে। খোঁপা ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে খোলা পিঠে। আঁচলের আধখানা মাটিতে লুটোয়।’

কোমরে আঁচল জড়িয়ে বঁটি বিছিয়ে ইলিশ মাছ কাটতে বসে লীলাময়ী। জ্যোতিরিন্দ্র বর্ণিত কুলদার বয়ানেই শোনা যাক— ‘কান গরম হয়ে গিয়েছে আমার। মাথা ঝিমঝিম করছে। বুঝি আশঙ্কা ভয় ও লোভ একসঙ্গে আমার চোখে ফুটে উঠেছে তখন। আমি পুরুষ। কিন্তু ওরা পারে মনের ভাব অনেকক্ষণ গোপন রাখতে। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা। লীলাময়ী তখন কিনা অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছে।

“আপনার স্ত্রী উঠে দাঁড়াতে পারে না?”

“একেবারে অচল।” দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, অবশ্য অন্য কারণে। ওর হাতে মাছ দু’খণ্ড হয়ে বঁটির বুক থেকে থালায় নেমে এল। তাজা লাল রক্ত। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম।

“দেখুন কেমন টাটকা ইলিশ।”

বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করলাম। রক্তের এক ফোঁটা ছিটকে ওর গালে পড়েছে, নাকের পাশে। হাতের পিঠ দিয়ে, ও তাই মুছতে চেষ্টা করছে বারবার।

“আরেকটু নিচে।” রুদ্ধশ্বাসে বললাম।

কিন্তু এবারও ঠিক জায়গায় হাত পৌঁছল না।

“হল না,” বললাম, “আরও ওপরে।”

“দিন না মুছে।” কাতর চোখে ও আমার দিকে তাকাল। হাত জোড়া, পারছে না নিজে। মনে হল গেলে ওর রক্তবর্ণ একটা তিল। হাত কাঁপছিল আমার, ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। নুয়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে রক্তের দাগ মুছে দিলাম।’

গল্প এর পর অন্য দিকে মোড় নেয়। কিন্তু সে কথা এখানে নয়।

এই গল্প পড়ার পর যেটা পাঠককে ভাবায়, সেটা হল, ইলিশের রক্ত তবে গালের উপর কামনাঘন রক্তবর্ণ তিলও হয়ে উঠতে পারে? জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর ‘মঙ্গলগ্রহ’ গল্পে ঠিক সেটাই দেখিয়েছেন আমাদের। তাঁর এক ও অদ্বিতীয় স্টাইলে।

ডুয়ার্সের অনাদৃত রতন

লোকসংস্কৃতির সুনীল পাল

'ডুয়ার্স' এই শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চক্ষুপথে ভেসে ওঠে বন্য প্রাণ। অন্তহীন সবুজের সমারোহ নীরব নিস্তব্ধ বনভূমি। তারপর জুতসই বিশেষণ, অলংকার। মোহময়ী, রূপবতী, রূপসি, এনচ্যানটিং, ম্যাগনিফিশিয়েন্ট শব্দ। বিশ্ব জুড়ে ডুয়ার্সবন্দনা, পর্যটন মানচিত্রে, ওয়েবসাইটে। ফেসবুকের দৌলতে ডুয়ার্স এখন প্রাণবন্ত উজ্জ্বল, ভ্রমণপিপাসুদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। তারপর দল বেঁধে চলো যাই। হইচই মৌজ মস্তি হুল্লোড়। প্রকৃতিপ্রেমী আর কয়জন। আজকাল বিভিন্ন ভ্রমণ সংস্থা ডুয়ার্স বেড়ানোর প্যাকেজ টুর চালু করে দিয়েছে। রিসর্ট, হোমস্টে, হলিডে হোম, সরকারি অতিথিনিবাস। টুরিস্ট লজের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। এত কিছু আয়োজনের পর ডুয়ার্স যেন অদেখা অচেনা অনুচ্চারিত থেকে যায়।

যবে থেকে ডুয়ার্সের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, শুধু প্রকৃতির অমোঘ আকর্ষণ নয়, ডুয়ার্সের সেইসব মনের মানুষ, যাঁরা সাহিত্য, সংগীত, লোকসংস্কৃতির অঙ্গন, ঘরগেরস্থালি, যাঁদের গায়ে মাটির গন্ধ, তাঁরা পাদপ্রদীপের নিচে পড়ে থাকলেন। প্রকৃত অর্থে তাঁরাই ডুয়ার্সের মণিরত্নস্বরূপ। দু'দিনের বৈরাগী নন। জলপাইগুড়ির সুলেখক বিমলেন্দু মজুমদার, গোঁসাইয়ের হাটে রাভাপল্লিতে গনাদ রাভা, টোটোপাড়ার ধনীরাম টোটো, মাদারিহাটের অবনী দাম। এমনই একজন মানুষ কামাখ্যাগুড়ির সুনীল পাল। আশি ঊর্ধ্ব এই মানুষটি নীরবে কাজ করেছেন মেচ, রাভাদের উপর। শীততাপ ঘরে, ড্রয়িং রুম, ওয়েবসাইট, ইন্টারনেটে ঘেঁটে নয়, জীবনযুদ্ধ করে। কিন্তু পড়ে থাকলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। ক'জন ডুয়ার্সপ্রেমী তাঁকে নিয়ে আলোচনা করেছেন?

পেশায় ছিলেন গ্রামসেবক। নেশা, রাভা, মেচ সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জানা। যাঁদের সুখ-দুঃখ, লোকগান, ছড়া-পাঁচালি, বাদ্যযন্ত্র যাবতীয় বিষয় লেখার মধ্যে তুলে ধরেন। মূলত লিটল ম্যাগাজিনে। দক্ষিণবঙ্গ-উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আলোকপাত করা। অথচ প্রচারের আলোতে আসতে পারলেন না। অনেকে রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা করেছেন উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জনজাতিদের উপর। কেউ কেউ ডক্টরেট ডিগ্রিও অর্জন করেছেন। সুনীলবাবু যে তিমিরে, সেই তিমিরেই। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে আলিপুরদুয়ারের তিনুদা, মানে তিনু বিষ্ণুর বসুধা প্রিন্টার্সের ঘরে। একদা বঙ্গের কবি, লেখক, শিল্পীদের নির্ভেজাল আড্ডাস্থল ছিল তিনুদার প্রেস। মনে পড়ে, একদিন সকালবেলায় জগন্নাথদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনুদার প্রেসে গিয়েছি। তিনুদার প্রশ্ন— 'গৌরীবাবু, সুনীলবাবুর সঙ্গে পরিচয় আছে? লোকসাহিত্যের উপর প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন। ছোট্ট চটিপারা একখানি বই তিনুদা ছেপেছেন সুনীলবাবুর।' নাম সম্ভবত লোকায়ত ছড়া জাতীয়। সুনীলবাবুর সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়। বললেন, 'একবার কামাখ্যাগুড়িতে আমার বাড়িতে আসুন। থাকবেন আমার বাড়িতে। রাভাদের গ্রামে নিয়ে যাব। ওদের নাচগান, জীবনযাত্রা আপনার ভাল লাগবে।' পরবর্তীকালে আলিপুরদুয়ারের লেবুবাগানের কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্যর সঙ্গে প্রথম বেড়াতে যাই কামাখ্যাগুড়ি। কৃষ্ণর নিজের বাড়ি কামাখ্যাগুড়িতে। ছ'টি রাত সুনীলবাবুর বাড়িতে থাকা, খাওয়া এবং বেড়ানো। রাভাদের উপর অগাধ জ্ঞান। প্রচুর তথ্য তাঁর কাছে জমে আছে। সম্ভবত অডিয়ো ক্যাসেটে। কিন্তু এত বেশি উদাসীন, আত্মপ্রচারে অনীহা যে কিছুই করলেন না। অনুরোধ করেছিলাম, এদিক-ওদিক এযাবৎ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যেসব গদ্য আপনার রয়েছে, সেসব গ্রন্থাকারে প্রকাশ করুন। উত্তর— 'ধুর। ওসব নিয়ে ভাবি না। নিজের আনন্দে লিখি, ব্যাস।'

ধীরে ধীরে সুনীলবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। পরিচয় হয় কামাখ্যাগুড়ির সুজিত পাল, রামা সরকার, দীপক, ভুতুদের সঙ্গে। আমি লোকসংস্কৃতির বোদ্ধা, সবজান্তা পণ্ডিত নই। তবে বেড়ানোর ফাঁকফোকরে রাভা, মেচ জনজাতির ঘরসংসার, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, সাংস্কৃতিক জীবনচর্চা বিষয়ে একটু কৌতূহল, উৎসাহ দেখে ভাল লাগার একটা অনুভূতি অবশ্যই মনের গভীরে রেখাপাত করে। চলার পথে তারা আমার অন্তরকে ছুঁয়ে যায়। সুনীলবাবুর সঙ্গে নানারকম আলোচনার ফাঁকে তাদের প্রসঙ্গ উঠে আসত। আড্ডা হত স্থানীয় চা-দোকানে, কবি-লেখকদের সঙ্গে। সুনীলবাবুর অনুরোধে একবার নয়, বার দুয়েকের বেশি বোঁচামারিতে বেড়াতে যাই। বলা বাহুল্য, পাড়ায় সমিতির সভাপতি মানুবাবুর চেষ্টায় তাঁরই গাড়িতে সুনীলবাবুকে সঙ্গে করে দেখতে যাই নাথুর হাট ওয়েস্টল্যান্ডে। তখন যার পোশাকি নাম রসিক বিল পক্ষীনিবাস। কামাখ্যাগুড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। কত বছর আগের কথা। কিছুই ছিল না, তবে প্রচুর দেশান্তরী পাখির আগমন ঘটত শীতের সময়। সুদীর্ঘ জলাভূমি ছিল কচুরিপানা ঠাসা। মানুবাবু দেশি নৌকা, মাঝি ম্যানেজ করেন। আমরা তিনজন বসি। লগি ঠেলে, কচুরিপানা ঠেলে, পাখি দেখতে দেখতে যাওয়া। রসিক বিল এখন জমজমাট, প্রতিদিন ভিড়। পিকনিকের সময় তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। পরবর্তীকালে তুফানগঞ্জ থেকে 'ঝড় তুফান' পত্রিকার জীবন দে, চেয়ারম্যান ভাওয়ালবাবু, বোঁচামাড়ি হাই স্কুলের মাস্টারমশাই মিলে রসিক বিল পর্যবেক্ষণে আসা। মানুবাবুর সঙ্গে দেখতে যাই সারাখাতা। রায়ডাক চা-বাগানের পিছনে টিয়ামারি জঙ্গল। টিয়ামারিতে দাঁড়িয়ে ভুটান পাহাড় অসাধারণ লাগে। সবই পুরনো স্মৃতি। মানুবাবু, জীবনদা পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সুনীলবাবু বার্ধক্যে কাবু। জবুথবু। বছরখানেক আগে কামাখ্যাগুড়িতে নেমে পড়ি বারবিশা বেড়িয়ে। হাটবার বলে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড়ে হাঁটাচলা দায়। সুজিত, ভুতুকে খুঁজে পেলাম না। রানার বাড়িতে যাই। বিছানায় শুয়ে কবিতা পাঠ করছে। দুপুরে দুটো ডাল-ভাত-বেগুন পোড়া পরম তৃপ্তিতে খাওয়া। অনেক সুখ-দুঃখের আলাপ। তারপর হাঁটতে হাঁটতে সুনীলবাবুর বাড়ির দিকে। হঠাৎ দেখি রাস্তায় লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়ানো। এ কী চেহারা হয়েছে সুনীলবাবু? 'বয়স তো কম হল না গৌরীবাবু। চলেন, বাড়িতে যাই। এক কাপ চা তো খাবেন।' সুনীলবাবু, আপনার লেখাপত্র দিয়ে একটা বই ছাপুন। বিষাদ বিষণ্ণ বিমর্ষ ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'আর কী হবে? ওসব নিয়ে ভাবি না।' ঘণ্টাখানেক গল্প করে বিদায় নিই। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। সবাই তো একে একে চলে যাচ্ছে। বাজারে আসতেই আলিপুরদুয়ার যাবার অটো পেয়ে যাই।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

এখন ডুয়ার্স প্রকাশিত বই

পর্যটনের বই

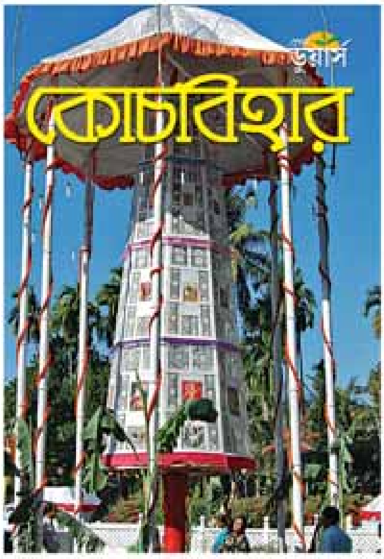

কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

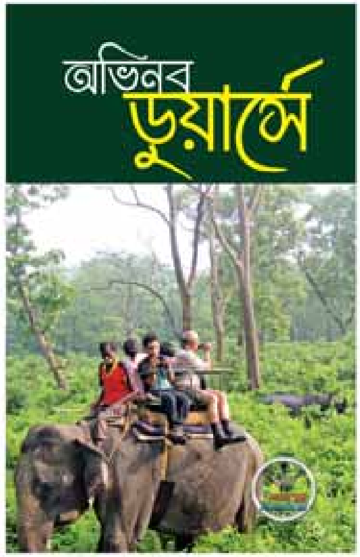

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

চা-শিল্পের বই

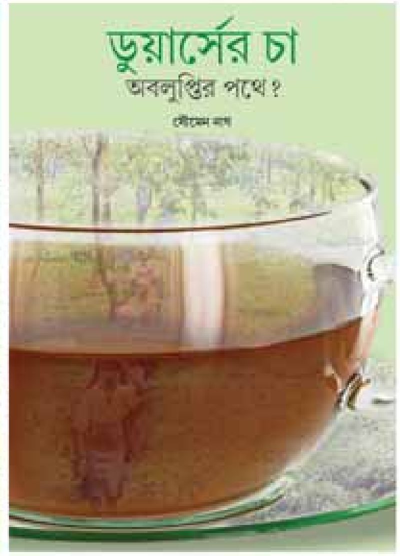

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

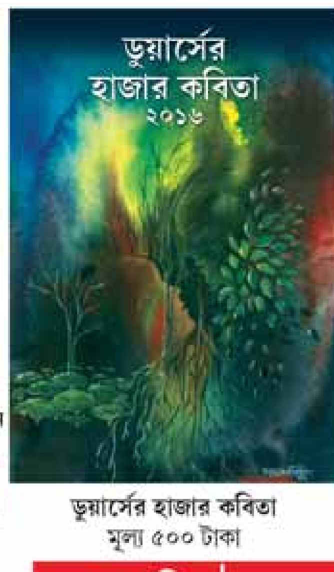

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

সবকটি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান	আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

কলকাতায়: দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-7 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.